সাড়া আংশিকরূপে প্রগতিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। আংশিকরূপে, কারণ প্রকাশক দিলেন তাড়া, এবং প্রগতি পড়্‌লো পেছিয়ে। তাই প্রগতির সম্পাদকদের অনুমতি নিয়ে সম্পূর্ণ বই প্রকাশকের হাতে দিতে বাধ্য হ'লাম।

বইয়ের প্রচ্ছদ-সজ্জা শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের করা।

বু. ব.

এই আমার প্রথম উপন্যাস

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে

দিলাম,

যে-লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা

সেই মানুষের প্রতি অনুরাগের সমান—

এ-বই তাঁর উপযুক্ত বলে' নয়,

আমার প্রথম বলে'।

২৫. ১. ১৯৩০ শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সূচী

ঘুম-পাড়ানি গান

চারিদিকে শাদা বরফের পাহাড় কাচের উপর প্রতিবিম্বিত রৌদ্রের মতো ঝল্‌মল্‌ করিতেছে—চাহিয়া থাকিতে গেলে দারুণ দীপ্তিতে চোখের পলকগুলি যেন পুড়িয়া যায়। নীচে একটু-খানি গোলাকার জমি তৃণে-তৃণে শ্যামল হইয়া আছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সে উপরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল; বহু ঊর্দ্ধে কে যেন একটিমাত্র নীল চোখের অপলক দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে, পর্ব্বত-শৃঙ্গের প্রান্তভাগ তীক্ষ্ণ ও ক্ষীণ শলাকার মতো সেই একটি চোখকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভ্রূ ও কপালের চাম্‌ড়া কুঞ্চিত করিয়া উপরের দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া রহিলে এইটুকু চোখে পড়ে কি না পড়ে।

শাদা বরফের শীতল দেয়ালগুলো সব দিক হইতে তাহাকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে, নিঃশ্বাস-বায়ুর দুর্ভিক্ষে সে হাঁপাইয়া উঠিল।

পাহাড়ের খাড়া গায়ের উপর বুক রাখিয়া দু'টি হাতের উপর শরীরের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া একটু-একটু করিয়া সে কাৎরাইতে-কাৎরাইতে উপরে উঠিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার পেট কাটিয়া যাইতেছে, কঠিন বরফের উপর হাতের নখ্‌ বসে না—কোনোমতে একটু ফস্‌কাইতে পারিলেই হাড়-গোড় সুদ্ধ চুর্‌মার্‌ হইয়া যাইবে। নিজের বুক দিয়া পাহাড়ের বুক ঘষিতে-ঘষিতে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজকে ঊর্দ্ধাভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

চূড়ার কাছাকাছি যখন আসিল, তখন তাহার শরীরের গাঁটগুলিকে কে যেন চিবাইয়া খাইতেছে। তবু সে একবার শেষ চেষ্টা করিল। দুই হাতে ভর দিয়া গলা বাড়াইয়া সে চূড়ার উপরে একবার তাকাইল। ঐ তো।

সেখানে অসীম তুষার-প্রান্তর আর অসীম আকাশ ধূ-ধূ করিতেছে; আকাশে রৌদ্র ও বর্ষা একই সঙ্গে নামিয়াছে, আর রামধনু-রঙীন টুক্‌রা-টুক্‌রা বরফ পাখীর পালকের মতো হাল্কা হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া একটু যেন জিরাইয়া নিতেছে! অতি অস্পষ্টভাবে সে একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইল; আকাশের রৌদ্র দিয়া রচিত তাহার স্বচ্ছ, শুভ্র প্রতিমাটিকে ঘেরিয়া কঠিন নীহারের অবগুণ্ঠন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সেই মূর্ত্তিটিকে একটু ভালো করিয়া দেখিতে যাইবে, অম্‌নি হাত পিছ্‌লাইয়া বিপুল বেগে নীচের দিকে নামিতে লাগিল।

মলিনার কাঁচা ঘুম ছেলের কান্নার শব্দে ভাঙিয়া গেল; চোখ না মেলিয়াই অভ্যাসের জোরে ছেলের মাথাটি খুঁজিয়া পাইয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল। যে-বিষম ভয় এতক্ষণ সাগরের কণ্ঠরোধ করিয়া ছিল, মায়ের হাতের স্পর্শে তাহা নিমেষে মিলাইয়া গেল। মায়ের বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া নিরাপদ নিশ্চয়তার অপরিসীম আনন্দে সে আরো জোরে ফুঁপাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ ভারি গলায় বলিয়া উঠিল, আহা!—এত রাত্তিরে ছেলেটা আবার চ্যাঁচাতে সুরু কর্‌লে কেন?

মলিনা সন্ত্রস্ত হইয়া সাগরকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া নিজের বুকের মধ্যে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল।

তবু ছেলের কান্না থামে না।

ব্যোমকেশ একটু নড়াচড়া করিয়া বিরক্তিভরে আদেশ

করিল, যেমন করে' পারো থামাও ওকে। রাত্তিরে একটু ঘুমুতেও দেবে না দেখ্ছি !

মলিনা ছেলেকে বুকে লইয়াই নীরবে খাট হইতে নামিয়া আসিল, তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলিয়া সাম্নের খোলা ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। ছেলের কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া বলিল, কি রে, স্বপ্ন দেখ্ছিলি !

দু'টি ভীতু ও দুর্ব্বল মুঠি দিয়া মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সাগর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে শুধু কহিল, হুঁ।

ছেলেকে লইয়া মলিনা লঘু পদক্ষেপে ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কাঁধের উপর অনেকগুলি অবিন্যস্ত চুল রাশীকৃত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে সমস্তটা মুখ সবলে পাতিয়া রাখিয়া সাগর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মৃদু কেশ-সুগন্ধ বুক ভরিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। এখনো তাহার চোখ দিয়া যে সামান্য দু'চারিটি জলের ফোঁটা পড়িতেছে, তাহাতে মলিনার চুলগুলি একটা আর-একটার সঙ্গে আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল।

আকাশে কোথায় যেন চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু শ্রাবণ-মেঘের মুখ-গহ্বরে তাহা ডুবিয়া গেছে। কোথাও হয়-তো বৃষ্টি হইতেছে, তাই বাতাসটা একটু ভিজা-ভিজা। বোধ হয় শীতেই, মলিনার সারাটা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়া উঠিল। গায়ের আঁচলটুকু দিয়া ছেলেকে ও নিজেকে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া সে সেই স্বল্প আলোকে একখানি শুভ্র ছায়ার মতো বিচরণ করিতে লাগিল।

সাগরের চোখের জল তখন শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু থাকিয়া-থাকিয়া সে হঠাৎ এক-একবার ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। মলিনা গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতে-গাহিতে সেই তালে-তালে ছেলের পিঠ চাপ্‌ড়াইতে লাগিল।

অতি সাধারণ, সহজ একটি সুর ;—গ্রাম্য, কারুকলাবর্জ্জিত গোটা কতক কথা—তাহাও সব মনে নাই। তাহার ছেলে-বেলাকার সখীরা শীতের প্রত্যূষে উঠিয়া এই গান গাহিয়া স্নানান্তে কাঁপিতে-কাঁপিতে ফিরিয়া আসিত—সেই সুরটি তাহার মনের মধ্যে বসিয়া গেছে। উহারা কি-একটা ব্রত করিত, মলিনা কখনো সে-সব করে নাই।

গানের পদ একটা মনে আসে তো অন্যটা হারাইয়া যায়। মলিনা শেষে গানটা ছাড়িয়া দিয়া সুরটাকে লইয়াই গুন্‌গুন্ করিতে লাগিল। মনে হইল, ঐ একটি সুর শতবার, সহস্রবার গাহিলেও যেন তাহার তৃপ্তি হইবে না।

চুলের মৃদুগন্ধ নেশার মতো সাগরকে ঘুম পাড়াইয়া গিয়াছে, বহুক্ষণ যাবৎ তাহার শান্ত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মলিনার চুলগুলি ঈষৎ নড়িতেছে। কিন্তু মলিনার সেদিকে খেয়ালই নাই, সেই একটি সুর গুঞ্জন করিতে-করিতে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতে আজ তাহার বড় ভালো লাগিতেছে।

বাতাস কখন দুরন্ত হইয়া বহিতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে মেঘ ছিঁড়িয়া গিয়া হঠাৎ এক অঞ্জলি জ্যোৎস্না মলিনার দেহে আসিয়া লাগিল। মলিনা চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ গান থামাইয়া দিল। আঁচলের নীচ হইতে সাগরকে সন্তর্পণে বাহির করিয়া কোলের

উপরে আলগোছে রাখিয়া সেই করুণ জ্যোৎস্নায় তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার দুই গালে যেখানে চোখের জলের দাগ সব চেয়ে ম্লান হইয়া আছে, চোখের দীর্ঘ, চিকণ পলকগুলি আসিয়া ঠিক সেইখানটিতে স্পর্শ করিয়াছে। চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে মলিনা সহসা অনুভব করিল যে সাগর বাঁচিয়া আছে। সাগরের বাঁচিয়া থাকাটা কতই যেন আশ্চর্য্য! জ্যোৎস্নার সঙ্গে গা মিশাইয়া দিয়া তাহার দেহ-লগ্ন হইয়া এখন যে ঘুমাইতেছে, সে তাহারই ছেলে, এ-কথাটা মলিনার মনে এতই অপূর্ব্ব ও রহস্যময় ঠেকিল যে সেই চোখের জলের দাগে কলঙ্কিত কোণটিতে একবার চুমা দিতেও তাহার সাহস হইল না।

১

গ্রীষ্মের এক সকালবেলায় চোখ মেলিয়া সাগর দেখিল, রৌদ্রে তাহার বিছানা ভাসিয়া গিয়াছে। গত রাত্রে দারুণ গরম সহ্য করিতে না পাইয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মা-র নিদ্রাতুর চোখ দুইটিকে একটিবারও বুজিতে দেয় নাই। পরে, ভোরের দিকে কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিল, অনেক বেলা হইযাছে, মা ও বাবা দুইজনেই অনেকক্ষণ শয্যা-ত্যাগ করিয়াছেন। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া সে শুনিতে পাইল, ভাঁড়ার ঘরে ষ্টোভ জ্বলিতেছে।

সাগর যখন চুপে-চুপে পা টিপিয়া-টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া পিছন হইতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল, মলিনা তখন এক হাতে চা ঢালিতেছে ও অন্য হাত দিয়া লুচির তাওয়ায় খুন্তি খোঁচাইতেছে। এই আকস্মিক স্নেহের উচ্ছ্বাসে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মলিনা বলিয়া উঠিল, আঃ এখন বিরক্ত করিস্‌ নি সাগর—সরে' যা।

সাগর দু'টি ছোট ছোট পা দিয়া মায়ের কটিদেশ বেষ্টন করিয়া নিজের মুখটা ঘুরাইয়া মলিনার মুখের খুব কাছে আনিয়া রাখিল। অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, মমা—

মলিনা হতাশ হইয়া খুন্তি ও চায়ের কেট্‌লি দুই-ই নামাইয়া রাখিয়া ছেলেকে ভালো করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলের নাকের কাছে তর্জ্জনী শাসাইয়া বলিতে লাগিল, এত বড় ছেলে হ'ল, এখনো মা-র কোলে না উঠ্‌লে চলে না—দেবো কালই স্কুলে পাঠিয়ে, মাষ্টাররা সেখানে কান মলে' দেবে—

কথাটা যেন আমলেই আনিবার মত নহে, এই ভাবে সাগর

নিজের দেহটাকে মায়ের বুকের সঙ্গে নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া নীরব রহিল।

মলিনা বুঝিল। ছেলের বাসিমুখে পর-পর অনেকগুলি চুমা দিয়া কহিল, যা এখন, মুখ-চোখ ধূয়ে' আয় গে। ইস্—চোখে যা পিঁচুটি জমেছে।

সাগর বুক-ভরা তৃপ্তি লইয়া বিদায় লইল। যত্ন করিয়া চোখের সমস্ত কেতুর মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু মুখে এক ফোঁটা জল ছোঁয়াইলও না। সেখানে তাহার মায়ের চুমাগুলি ঈষৎ মিঠা ও ঝাঁঝালো হইয়া লাগিয়া আছে।

চায়ের টেবিলে বাবা কথাটা পাড়িলেন। দেশলাইয়ের বাক্সের উপর একটা সিগারেট্ দিয়া টোকা মারিতে-মারিতে বলিলেন, কাল রাতে তোর কি হয়েছিল রে?

সাগরের কান পর্য্যন্ত লাল ও গরম হইয়া উঠিল। চায়ের পেয়ালার মধ্যে সে প্রায় নাক ডুবাইয়া দিয়া মুখ ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। মলিনা একবার ছেলের ঘাড়ের দিকে, একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, কি আবার হ'বে? ছেলেপিলেরা অমন একটু কেঁদেই থাকে।

ব্যোমকেশ গরম চায়ে গলা ভিজাইয়া লইয়া একটা আরামসূচক গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল, হ্যাঁ—ছেলেপিলেই তো! সাত বছর পেরিয়ে আটে পা দিতে চলেছে—এখনো মা-র আঁচল-ধরা হ'য়ে আছে। ওকে এ-বছর ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিই,—কি বল?

এক টানে সাগরের মুখ চায়ের পেয়ালা হইতে উঠিয়া আসিল।

মায়ের চোখের দিকে একখানি ভীত, কাতর চাহনি প্রসারিত করিয়া দিয়া সে আবার মুখ নত করিল।

মলিনা কহিল, পাগল হয়েছ? ওকে ইস্কুলে দেবে কি? ও তো পথ চিনে' যেতেও পার্‌বে না।

—পার্‌বে না তো আমায় উদ্ধার করে' দেবে একেবারে। তাই বলে' মূর্খ হ'য়ে থাক্‌বে? অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমি ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ।

—থাক্‌বেই তো আমার ছেলে মূর্খ হ'য়ে। তোমার কি?

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা শূন্য করিয়া মুখের সাম্‌নে খবরের কাগজ মেলিয়া ধরিয়া সিগারেট্ টানিতে লাগিল। মনে-মনে বোধ হয় একটু রাগও করিল।

মলিনা যেটুকু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিল, হাসি দিয়া তাহা নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া বলিল, এই নোয়াখালিতে কি ভালো ইস্কুল আছে যে পাঠাবে? ও বড় হোক্—তারপর কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিয়ো।

সাগর চোখ বুজিয়া টেবিলের নীচে গোপনে দু'খানা হাত জোড় করিয়া চট্ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ফেলিল, সে যেন কখনো বড় না হয়।

ব্যোমকেশ ততক্ষণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল আবর্তে ডুবিয়া গিয়াছে, সিগারেটের ফাঁক দিয়া অন্যমনস্কভাবে কহিল, হুঁ।

সাগরের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

মা বাবা দুইজনকেই অন্যমনস্ক দেখিয়া সাগর এক ফাঁকে

দু'টি হাত জোড় করিয়া তাহার উপর মাথা ঠেকাইয়া ফেলিল। মনে-মনে বলিল, হে ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

স্বামী আফিসে চলিয়া যাইবার পর মলিনা বিছানার উপর সারা দুপুরের মত্ গা এলাইয়া দিয়া ছেলেকে আহ্বান করিল, সাগর, শুতে' আয়।

সাগর তখন টেবিলে বসিয়া-বসিয়া একখানা কাগজের উপর লাল-নীল পেন্সিল্ দিয়া একটা মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিবার বিষম চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, সে প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, আমি শোব না।

মলিনা উদাসভাবে কহিল, বেশ। আজ্‌কে রাত্তিরে টাউন-হলে থিয়েটার্ হ'বে, দুপুরে খানিক্ ঘুমিয়ে না নিলে তখন যেতেও পার্‌বি নে। বলিয়া পাশ ফিরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

সাগরের ছবি আঁকার সখ এক ফুঁয়ে নিবিয়া গেল। টাউন্ হল্-এ সে ইতিপূর্ব্বে একবার থিয়েটার্ দেখিয়াছে—তাহা স্মরণ করিয়া অসহ আনন্দে তার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। ঘুমানো তো সামান্য কথা, মা তাহাকে বলুক্ না হাতের একটা আঙুল কাটিয়া ফেলিয়া দিতে!

সাগর মায়ের পাশে শুইয়া পড়িয়া প্রায় তিন-চার মিনিট্ চুপ্ করিয়া চোখ বুজিয়া রহিল, কিন্তু তবু মলিনা তাহার দিকে মুখ ফিরাইল না। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সাগর বলিয়া উঠিল, উঃ, মা-গো—

কি রে, কি হয়েছে? বলিয়া ত্রস্তভাবে মলিনা দুই বাহু দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল।

সাগর বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, কিসে যেন কাম্‌ড়েছে।

কোথায় রে? দেখি।

সাগর নিরুপায় হইয়া বাঁ হাতের কড়ে' আঙুলটি বাড়াইয়া দিল।

মলিনা দংশনের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইল না, তবু বলিল, পিঁপ্‌ড়ে। জ্বালা কর্‌ছে?

হুঁ।

মলিনা তাহার মুখের মধ্যে আঙুলটি ঢুকাইয়া খানিকক্ষণ চুষিল; তারপর জিজ্ঞাসা করিল, কমেছে?

হুঁ।

নে, এখন ঘুমিয়ে থাক্। রাত্তিরে থিয়েটারে নিয়ে যাব।

মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সাগর নিদ্রার ভাণ করিতে লাগিল।

মায়ের গায়ে কেমন যেন একটি মিষ্টি গন্ধ সর্ব্বদা জড়াইয়া আছে, সেই অতুল আঘ্রাণে সাগরের দেহ-মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

মলিনা কিন্তু এক সময় সত্য-সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল। সাগর টের পাইয়া অতি সাবধানে উঠিয়া বসিল। দিবা-নিদ্রার যন্ত্রণা-ভোগকে এত সহজেই ফাঁকি দিতে পারিল ভাবিয়া তাহার হাত-পা ছুঁড়িতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু সাহস হইল না, পাছে মা জাগিয়া উঠে।

ইঁদুরের মতো টুক্‌টাক্‌ করিয়া সে বাবার আলমারি খুলিয়া প্রকাণ্ড একখানা বই বাহির করিল, তারপর বাবার প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া ছবি দেখিবার মানসে বইয়ের পাতা খুলিল।

প্রথমবার সে যে-পৃষ্ঠা খুলিল, সেখানেই একখানা রঙীন ছবি ছিল। একটা গাছ নানা রঙের ফুলে ফুলন্ত হইয়া উঠিয়াছে, নীচে অজস্র মঞ্জরী ঝরিয়া পড়িয়াছে, আর সেই ঝরা ফুলের বিছানায় একটি ছিপ্‌ছিপে মলিন মেয়ে ঢিলা পোষাক পরিয়া শুইয়া আছে। সাগর নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই মেয়েটি কেন এ ভাবে এখানে শুইয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য বিষম কৌতূহলে মনটা তাহার আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। এ বইতে তাহা নিশ্চয়ই লেখা আছে। সে পড়িতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। দু' একটা কথা বানান্‌ করিয়া পড়িবার পরই তাহাকে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। কতদিনে সে ইংরাজি শিখিবে? ঐ মলিন মেয়েটি কেন ঐ গাছের নীচে অমন ভাবে শুইয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে কতকাল অপেক্ষা করিতে হইবে? সে একটা ছবিহীন পৃষ্ঠা বাহির করিয়া তাহার উপর অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দৃষ্টি সংবদ্ধ করিল, যেন সে সত্য-সত্যই বই পড়িতেছে—ছবি-দেখাটা তাহার উদ্দেশ্য নয়। এমন কি মাঝে-মাঝে বাবার অনুকরণে "বাঃ", "আহা-হা" ইত্যাদিও বলিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার পিছনে খুট্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। সে পিছনের দিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না, মস্ত ইজি-চেয়ারটা তাহার ছোট্ট দেহকে একেবারে গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত সে আবার পড়ায় মন দিল, কিন্তু একটু পরেই তাহার মুখ ও বইয়ের মাঝখানে আর একটি মুখ দেখা দিয়া বইখানাকে আড়াল করিয়া দিল।

সাগর রাগিয়া উঠিয়া বলিল, লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, সাগর রে!

সাগর একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল, গোল কোরো না বল্‌ছি, আমায় পড়্‌তে দাও।

শুনিয়া লক্ষ্মী তো হাসিয়াই খুন।—পেটে হাত দিয়া লুটোপুটি খাইতে-খাইতে বলিল, ওমা, তুই আবার ইংরিজি পড়্‌তে শিখ্‌লি কবে রে সাগর? ও—ও সাগর!

লজ্জায় সাগরের মুখ রাঙিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, এই একটু ছবি দেখ্‌ছিলাম। অত জোরে কথা বলিস্‌ নি লক্ষ্মী, মা জেগে উঠে' বক্‌বেন।

—আচ্ছা বেশ। তুমি দেখো সাগর, আমি কথাটি ক'ব না। বলিয়া দুই পা দিয়া সাগরের হাঁটু দুইটা বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গ্যাঁট্‌ হইয়া বসিল।

সাগর নিম্নকণ্ঠে কহিল, আজ থিয়েটার্‌ দেখ্‌তে যাব। টাউন্‌-হল্‌-এ। মা নিয়ে যাবেন বলেছেন। তুমি যাবে?

লক্ষ্মী ঘাড় নাড়িল।

—কিন্তু ঘুম পাবে না তো?

লক্ষ্মী এবার উল্টা দিকে ঘাড় নাড়িল।

—আমারো পাবে না। আমি খুব রাত জাগ্‌তে পারি। বাবা বকেন বলে', নইলে রোজ রাত জেগে-জেগে পড়াশুনো কর্‌তুম। কী মজা, না রে?

লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া সাগর অনুমান করিতে পারিল যে পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থাকে সে বিশেষ মজার বলিয়াই বিবেচনা করে। এবারে সাগর কহিল, কথা ক'ও না লক্ষ্মী, আস্তে-আস্তে কইলে মা জাগ্‌বেন না।

সাগরের মুখের কথা না ফুরাইতেই লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, সত্যি, মা-রা এতও ঘুমোতে পারেন! আমার মা-ও পড়ে'-পড়ে' ঘুমুচ্ছেন। বিকেলে চোখ-মুখ ফুলিয়ে উঠে' বল্‌বেন, সারাদিন কোথায় ছিলি, লক্ষ্মী? কী মেয়ে গো বাবা, রাজ্যির দিন কেটে যায়, ওর চক্ষে একটু ঘুম নেই। বলিতে-বলিতে মাতার অনুকরণে লক্ষ্মী গালে হাত দিয়া মুখ-চোখের ভাব অত্যন্ত বিরস করিয়া তুলিল।

সাগর গম্ভীর মুখে বলিল, আমার মা-ও ঘুমোন্ বটে, কিন্তু তাঁর মুখ-চোখ ফেলে না, গালে হাত দিয়ে অমন বিশ্রী কথাও বলেন না।

লক্ষ্মী বলিল, সত্যি সাগর, তোর মা আমার মা-র চাইতে অনেক সুন্দর।

কথাটা মানিয়া লইবার পূর্ব্বে সাগর একটু সময় চিন্তা করিল। পরে বলিল, সুন্দর দেখ্‌তে চাস্ তো এই ছবিটে। বলিয়া সেই কুসুমশায়িতাকে লক্ষ্মীর চোখের সাম্‌নে খুলিয়া ধরিল।

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, ও এই বনের মধ্যে এসে শুয়েছে কেন?

সাগর মনে-মনে নিজের অজ্ঞতাকে ধিক্কার দিল। তবু আত্ম-

সম্মান বজায় রাখিবার স্পৃহা তাহার মধ্যে প্রবলতম হইয়া উঠিল বলিয়া একটা-কিছু সে বলিয়া ফেলিল, ও এক মালিনীর মেয়ে। রাজপুত্তুর ওকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলেন বলে' রাজা রেগে ওকে বনবাসে পাঠিয়েছেন।

লক্ষ্মী সাম্‌নের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ছবিখানা দেখিল। তাহার দুই-একটি চুলের ঘসা লাগিয়া সাগরের গাল চুল্‌কাইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী, যেন বিশেষভাবে তাহার কথা অনুধাবন করিয়াছে, এম্‌নি ভাবে বলিল, বেশ। আর ছবি আছে?

সাগর পাতা উল্টাইল।

প্রকাণ্ড টাউন্-হল্ ভরিয়া লোক গিষ্‌গিষ্ করিতেছে, ভিতরে প্রবেশ নিয়া অনাহূত যুবকমণ্ডলীর সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের সংঘর্ষ বাধিবার যোগাড়। স্‌টেইজের একেবারে সম্মুখে কয়েক সারি চেয়ার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য রাখা হইয়াছে—সাগর ও লক্ষ্মী সাগরের মা-বাবার সঙ্গে গট্‌গট্ করিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে গিয়া বসিল, পিছনের বিশৃঙ্খল জনসংঘের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। সাগর বার-বার নিজের দিকে চাহিতেছিল—মা তাহাকে যত্ন করিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন, ভিড়ের মধ্যে চলিবার সময় তাহার সুবিন্যস্ত চুল যেন একটু এদিক-ওদিক না হয়, সে-দিকে সে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছিল। আর মাঝে-মাঝে

লক্ষ্মীকে দেখিতেছিল, তাহার ময়ূরপঙ্খী শাড়িখানা আলো ও ছায়াসম্পাতে ক্ষণে-ক্ষণে এক-এক রঙে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার চুলগুলি ফাঁপিয়া উঠিয়া কপালে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মোটামুটি সাগর এইটুকু উপলব্ধি করিল যে তাহাদের দুইজনকেই বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছে, এবং এ-কথা কল্পনা করিয়া সে একটি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। লক্ষ্মীর পাশে একই চেয়ারে বসিয়া সাগর উদাসভাবে—বিশেষ কোনোদিকে নয়—এম্‌নিই তাকাইয়া রহিল—যেন কাহারো মুখের দিকে তাকাইলে তাহার মর্য্যাদার হানি ঘটিবে।

ডাঙায় রেলগাড়ি ও জলে স্টিমার আঁকা যবনিকা ঈষৎ কাঁপিতেছে, আর তাহার নীচে লাল একটি পর্দ্দার পিছনে এক সার মোমবাতি জ্বলিতেছে। ভিতর হইতে বাজ্‌নার শব্দ আসিতেছে, অসংখ্য লোকের যুগপৎ বাক্‌বিস্তার একটা জমাট্ শব্দপুঞ্জের মতো সেই বাজ্‌নাকে আহত করিয়া ফিরিতেছে। বসিয়া-বসিয়া সাগরের মনে নেশা ধরিয়া গেল। যবনিকার ঐ মৃদু-কম্পন যেন কোন্ অপরূপ রহস্যলোক হইতে একটি ইঙ্গিত বহন করিতেছে, মোমবাতির শিখায়-শিখায় এক প্রলুব্ধ চঞ্চলতা!—সাগরের মনে হইল, রাতের পর রাত্ এই দৃশ্যটিকে সে স্বপ্নে দেখিয়াছে।

সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, পর্দ্দা উপরের দিকে উঠিলে দেখা গেল, সিংহাসনে এক জম্‌কালো পোষাক-পরা রাজা বসিয়া আছেন, আর একদল সৈন্য এক অত্যন্ত সুশ্রী যুবককে

পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া তাঁহার কাছে বন্দী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

নাটক সুরু হইয়া গেল। রাজা বন্দীর মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ করিলেন। আপাদমস্তক শিহরিত হইয়া সাগর এক হাত দিয়া লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে চেয়ারের হাতলটাকে শক্ত মুঠিতে আঁকড়াইয়া রহিল। জল্লাদেরা মহোল্লাসে মাতিয়া বন্দীকে মশানে লইয়া যাইতেছে, এমন সময় আলুলিত কেশে, বিস্রস্ত বসনে অন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, উহাকে বাঁচাও। ঘাতকের হাত হইতে অস্ত্র ঝনৎকার শব্দে খসিয়া পড়িল, কিন্তু রাজা মহান্ নিষ্ঠুরতার সহিত অবিচল রহিলেন। তখন রাজার পায়ের উপর নিজকে লুটাইয়া দিয়া রাণীর সে কী কান্না!

সাগরের মাথাটা রিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। লক্ষ্মীর কণ্ঠে ন্যস্ত দৃঢ় বাহুবন্ধন অবশ, শিথিল হইয়া আসিল। লক্ষ্মীর ময়ূরপঙ্খী কাঁধের উপর মুখ গুঁজিয়া সে দেখিতে পাইল, দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—একটি পুষ্পিত তরু-তলে অসংখ্য মঞ্জরী ঝরিয়াছে, ও সেই ফুল-শয়নে রাণী রঙীন্ বসন পরিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার দুই ঠোঁট হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ এক অসম সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া সোজা স্টেইজের উপরে উঠিয়া রাণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; রাণী তাহার জন্য দুই বাহু বাড়াইয়া দিলেন, সে উৎসুক গতিতে ছুটিতে সুরু করিতেই হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল। রাণী বলিয়া উঠিলেন, দেখেছ, ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাণীর কণ্ঠস্বর একেবারে তাহার মায়ের মতো। সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া চোখ মুছিতেই দেখিতে পাইল, আবার যবনিকা পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে বিচিত্র কোলাহল উত্থিত হইতেছে, তাহার মা ও বাবা সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছেন ও লক্ষ্মী চেয়ারের হাতলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ঘুমে তাহারও চোখ ঢুলিয়া আসিতেছিল, সে আবার চোখ বুজিল।

ব্যোমকেশ বলিল, চাপ্‌রাশিটাকে দিয়ে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিই।

মলিনা বলিল, হ্যাঁ, তাই দাও। ফৈজুকে বলে' দাও, বিষ্টি নাম্‌লে শিয়রের জান্‌লাটা বন্ধ করে' দেয় যেন।

আলোকহীন পথে ছ্যাক্‌ড়া গাড়িতে চলিতে-চলিতে সাগর ও লক্ষ্মী দুই জনেরই ঘুম ছুটিয়া গেল। সাগর তাহার কনুই দিয়া লক্ষ্মীকে একটা ঠেলা মারিয়া ডাকিল, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী অম্‌নি সাড়া দিল, কি রে?

সাগর অনেকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিল, কী সুন্দর রাণী।

লক্ষ্মী, খুব যেন একটা গোপন কথা কহিতেছে, এইভাবে সাগরের কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া বলিল, বড় হ'লে আমিও অম্‌নি সুন্দর হ'ব।

সাগর লক্ষ্মীকে অত বড় বলিয়া কিছুতেই কল্পনা করিতে না পারিয়া বলিল, ধ্যেৎ।

লক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল, দেখিস্।

গাড়ি সাগরদের বাসার সাম্‌নে থামিতেই সাগর বলিয়া উঠিল, তুই আমার সঙ্গে আয় না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী আসিল, কিন্তু খোঁটা দিতে ছাড়িল না—কেন, ভয় কর্‌বে নাকি ?

অথচ, কথাটা লক্ষ্মীই প্রথমে তুলিল। ওদের দু'জনকে দোতলার ঘরে রাখিয়া ফৈজু একটু সময়ের জন্য কোথায় যেন গিয়াছিল ;—ইতিমধ্যে হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, হঠাৎ বাতাসে সোঁদাল মাটির মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পশ্চিমের খোলা জানালাটা দেওয়ালের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বাড়ি খাইয়া আবার খুলিয়া গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ দিয়া অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে বাহির হইয়া পড়িল, আমার ভয় কর্‌ছে রে সাগর !

কথাটা শুনিয়াই সাগরের সমস্ত হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। কিন্তু লক্ষ্মীর সাম্‌নে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করা চলে না। ভিতরে কাঁপিতে-কাঁপিতে সে প্রায় অকম্পিত কণ্ঠেই উচ্চারণ করিল, কই, না !

লক্ষ্মীর সমস্ত মুখ ততক্ষণে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ সাগরের মনে হইল, লক্ষ্মী বুঝি মরিয়া যাইতেছে। মাঘের সকালে সরস্বতীর পূজারীরা যেমন জোর করিয়া চোখ মুখ বুজিয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেম্‌নি নিজকে সে একরকম ধাক্কা দিয়াই খাট হইতে নামাইয়া ফেলিল, তারপর প্রত্যেক দরজার

কাছে একটি চেয়ার টানিয়া নিয়া তিন-তিনটা দরজা লাগাইয়া দিল, একে-একে নানারূপ কসরৎ করিয়া সবগুলি জানালাও বন্ধ করিল। যখন খাটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মধ্যে কেবল প্রাণটুকুই ধুক্‌ধুক্ করিতেছে, আর-সব নিথর, নিস্পন্দ, হিম হইয়া গিয়াছে। একটা চাদর টানিয়া দুইজনকেই তাহার মধ্যে আপদমস্তক আবৃত করিয়া সে ভিজা পায়রার মতো কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মী তাহাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া নিঃশ্বাস-পাতের মতো নিঃশব্দে বলিল, সাগর রে।

কোনো কথা কহিবার মত অবস্থা সাগরের ছিল না। খানিকক্ষণ পরস্পরের বুকের টিপ্‌টিপ্ শব্দ শুনিতে-শুনিতে উভয়েই নিষ্কলুষ শৈশবের প্রগাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল; —এমন ঘুম তাহাদের জীবনে আর আসিবে না, এ-কথাটা তাহারা কেহই তখন বুঝিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে ব্যোমকেশ ও মলিনা ফিরিয়া দুয়ারে ধাক্কা দিতে-দিতে সমস্তটা পাড়া জাগাইয়া তুলিল, কিন্তু উহাদের কাহারো পরিপূর্ণ ঘুমে একটু আঁচড়ও কাটিতে পারিল না। অবশেষে ফৈজুকে একটা জানালা ভাঙিয়া দেওয়াল বাহিয়া ভিতরে ঢুকিতে হইল।

ব্যোমকেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা রে, কী ঘুমুতে পারে ওরা, বাড়ি ভেঙে পড়লেও তো টের পাবে না।

মলিনা চাদরটা সরাইয়া ফেলিয়া দু'জনের গায়ে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, ইস্, ঘামে ভিজে' গেছে একেবারে। তারপর

দুই জনকে পৃথক করিয়া নিয়া একটা গামছা দিয়া তাহাদের গা মুছিয়া দিয়া একখানা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। স্বামীকে বলিল, তুমি না-হয় ক্যাম্প্‌খাটে বিছানা পেতে শুয়ে' পড়ো, আমি এখানেই থাকি।

ঠিক নদী বলা চলে না, ঐখান হইতেই বঙ্গোপসাগরের মুখ আরম্ভ হইয়াছে।

শহর ছাড়াইয়া নদীর ধারে ব্যোমকেশের বাংলা, কাছাকাছি আর বাড়ি-ঘর নাই; একমাত্র প্রতিবেশী হরনাথ বাবু, লক্ষ্মীর বাবা।

ভাটার সময় নদীটা শিটাইয়া মরার মতো পড়িয়া থাকে, ওপারে সুপারি-নারিকেল-পল্লবিত কূলরেখা শ্যামল হইয়া ফুটিয়া উঠে, পূব দিকে শাস্তাসীতা দ্বীপের চোখা মুখটা দেখা যায়, মাঝে-মাঝে অসংখ্য ছোট-ছোট চর মাথা চাড়াইয়া উঠিয়া আকাশ ও পৃথিবীর বাতাসের সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় করিয়া লয়। কিন্তু বঙ্গোপসাগর তাহার কন্যাটির এই দৈন্য সহ্য করিতে পারে না, প্রবল যৌবনের মতো সে জোয়ারের ঢেউ পাঠাইয়া দেয়, বজ্রের শব্দ ও বিদ্যুতের বেগ লইয়া তাহা উন্মত্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসে, নিমেষে মরা নদী কূলে-কূলে কালো হইয়া দুলিয়া উঠে, দূরের তটরেখার সমস্ত চিহ্ন সবল ঢেউগুলির ক্ষুধিত জিহ্বা চাটিয়া মুছিয়া নেয়। নদী তখন গর্জ্জিয়া, কুঁদিয়া, মাথা খুঁড়িয়া, আছড়াইয়া পড়িয়া কি যে করিবে, এবং না করিবে তাহা যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না।

বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই জোয়ার বা 'শর'-দেখিতে শহরের সমস্ত লোক নদীতীরে জড়ো হয়, ভাদ্রের অমাবস্যায় বহুদূরের সব গ্রাম হইতে রাশি-রাশি নর-নারী আসিয়া জুটে। দেখিয়া বাড়ি ফিরিতে-ফিরিতে বলাবলি করে, দেখিবার মত জিনিষ বটে।

সাড়া

দৌলতখাঁর সর্ব্বনাশী প্লাবনের গল্প শুনিতে-শুনিতে নোয়াখালির লোক বড় হইয়া উঠে, কখন নদী ক্ষেপিয়া এই ছোট শহরটিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, এ-ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই কম্পমান।

সাগরের দোতলার ঘরের দক্ষিণের জানালা দিয়া নদী দেখা যায়, এই নদীর মুখে মুখ রাখিয়া সাগর বড় হইয়া উঠিয়াছে, এই নদীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে সাগর কথা কহিতে শিখিয়াছে।

পলাতক বালক সাগর—নিতান্তই ভীরু ও দুর্ব্বল। তাহার পৃথিবীর সবটুকু মায়ের গায়ের গন্ধে ভরা। মায়ের মুখের চুমা খাইয়া-খাইয়া বুক যখন কানায়-কানায় ভরিয়া যায়, তখন জানালার উপরে বসিয়া সে নদীর দিকে চাহিয়া থাকে; নদীর গর্জ্জন শুনিয়া মনে হয়, এ-ও ইংরাজির মতো এক দুর্ব্বোধ্য ভাষা, বড় হইলে সে তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিবে।

সঙ্গীর মধ্যে এক লক্ষ্মী। তা-ও লক্ষ্মীকেই রোজ-রোজ আসিতে হয়, মা-কে ফেলিয়া বাড়ির বাহির হইতে সাগরের সাহস হয় না, যদি ফিরিয়া আসিয়া দেখে, মা হারাইয়া গিয়াছে!

দীর্ঘ দিনের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ নদীর কল্লোল-ধ্বনিতে ভরিয়া যায়।

সাগরের আর তর্ সহে না। ঐ কুসুমশাহিতাকে সে কখনো ভুলিতে পারে না, এবং লক্ষ্মীর কাছে সে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, এ-কথা ভাবিয়া মন তাহার প্রায়ই কাতর হইয়া উঠে। লক্ষ্মী

যদি কখনো ইহা টের পায়, তাহা হইলে হয়-তো তাহার সঙ্গে আর কথাই কহিবে না। কোনো দেবতা আসিয়া যদি তাহাকে একটি মাত্র বর দিতে চাহিতে, তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় সে ইংরাজি-ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইত।

কিন্তু কলিযুগে দেবতারা নাকি অভিমান করিয়া থাকেন, তাই ক্ষমতায় ও দূরত্বে দেবতাদের ঠিক নীচেই যাহার আসন, তাহার কাছেই যাইতে হয়। আগের রাত্রে ঘুমাইবার আগে সে মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়াছিল। তাই সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া সাগর প্রথম যে-কথা কহিল, তাহা এই : বাবা, আমাকে ইংরিজি শেখাবে ?

ব্যোমকেশ প্রথমে বিস্মিত ও পরে পুলকিত হইল। কিন্তু মুখে কহিল, এখন কেন ? বল্লাম, ইস্কুলে যা—ছেলে তখন কেঁদেই আকুল। আমি পার্‌ব-টার্‌ব না ও-সব ছেলে-ঠ্যাঙানোর কাজ কর্‌তে।

মলিনা বলিল, ঠ্যাঙানোর ভারটা না-হয় আমিই নিচ্ছি, পড়ানোর ভার তুমি নাও। কেন ? রোজ আপিস্ থেকে ফিরে' এসেই আবার ক্লাবে না গেলে কি ঘুম্ হয় না রাত্তিরে ? সে-সময়টা যদি ওর পেছনে—

ব্যোমকেশ মুখ-চোখ বিষম বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁঃ—এদিকে সারা দুপুর কলম পেষো, আবার রাত্তিরে বাড়ি ফিরে' ছেলে পড়াও! আমি যেন আর মানুষ নই একটা! যেমন করে' পারো তোমার ছেলেকে মানুষ করো, আমি কিছু জানি নে। যেমন আমার কথা শুন্‌লে না—

বলিয়া ব্যোমকেশ রাগে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

মলিনা বলিল, আমার ছেলেকে মানুষ করবার ভার যে তোমাকে দিচ্ছি, এই তোমার সৌভাগ্য।

ব্যোমকেশ মাথা নামাইয়া কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া বলিল, প্রণাম, দেবী। তোমার এ অনুগ্রহ চিরকাল মনে থাক্‌বে।

মলিনা মুখে হাসিল বটে, কিন্তু মনে-মনে কহিল, সত্যিই থাক্‌বে।

সাগর যে ভবিষ্যতে ভয়ানক একটা-কিছু বড় হইয়া উঠিবে, এ-বিষয়ে মলিনার মনে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না কিনা!

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাতেই ব্যোমকেশ বুঝিল যে বড় কঠিন কাজ। কোথায় যে আরম্ভ করিতে হইবে, ব্যোমকেশ তাহাই নির্ণয় করিতে পারিল না। বানান ও ব্যাকরণ শিখাইবার মত ধৈর্য্য ও-বয়সে তাহার আর ছিল না, তদুপরি ডিপুটিগিরি করিতে-করিতে মেজাজ দিন-দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। ছেলেকে গোটাকতক প্রশ্ন করিয়া বুঝিল যে সে সোজা ইংরাজি বুঝিতে, লিখিতে এবং কহিতে পারে। মাথায় হাত দিয়া ব্যোমকেশ ভাবিতে লাগিল, কোন্ দিক দিয়া শিক্ষা সুরু করা যায়। সাগর বিনা সাহায্যে কি করিয়া এইটুকু শিখিয়া ফেলিল, তাহা ভাবিয়া ব্যোমকেশ বিস্মিত এবং গোপনে একটু গর্ব্বিত হইল।

মলিনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই বুঝি পড়ানো হচ্ছে?

ব্যোমকেশ অতি-বিনীত সুরে জবাব দিল, আজ্ঞে, আপনার ছেলেকে শেখাবার কিছুই নেই।

মলিনা হাসিয়া বলিল, তা হ'লে এম্-এ পাশ করা তোমার বৃথাই হয়েছে। তারপর স্নেহ-দৃষ্টিতে সাগরের মুখখানা মুছিয়া দিয়া :

কি রে, এরি মধ্যে তুই তোর বাবাকে হারিয়ে দিলি ?

লজ্জায় সাগরের গাল দুইটি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা ব্যোমকেশের সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। মলিনাকে কহিল, তুমি ঐ চেয়ারটাতে ওকে কোলে নিয়ে বোসো।

তারপর আল্‌মারি খুলিয়া ল্যাং-এর আরব্যোপন্যাসখানা বাহির করিয়া ছেলেকে কহিল, শোন্।

মায়ের কোলে বসিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া ছেলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া বই হইতে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ ?

এতক্ষণে সাগর শুধু এইটুকু বুঝিয়াছে যে হারুন্-অল্-রশিদের রাজত্বের সময় বোগ্‌দাদে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা বাস করিত। কিন্তু পাছে বাবা পড়া থামাইয়া বুঝাইতে আরম্ভ করেন, এই ভয়ে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

বছর ঘুরিয়া গেল।

৩

এই এক বৎসরে সাগরের পৃথিবীর পরিধি অনেকখানি বাড়িয়া গেল। আজ আর তাহার বসুন্ধরা মায়ের গায়ের গন্ধে আচ্ছন্ন নহে; এক অজানিত মায়া-পুরীর দরজার সোনার পর্দাগুলি চঞ্চল বাতাসে ঈষৎ দুলিয়া উঠিতেছে, সেই একটুখানি ফাঁক দিয়া যেটুকু দেখা যাইতেছে, তাহারই আভাষে এই স্বপ্ন-বিলাসী বালকের মন উদ্ভ্রান্ত, উদাস হইয়া উঠিয়াছে।

আরব্যোপন্যাসের অলোকসামান্যা সুন্দরীদের-স্বপ্নে তাহার প্রতি রজনীর নিদ্রা ভরিয়া যায়, দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ, নিস্তব্ধ অবকাশে নদীকল্লোলের শব্দে অসমসাহসী রাজপুত্রের অশ্বখুরধ্বনি শুনিতে পায়। সমস্ত মন মাঝে-মাঝে ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সাগর আর আপনাকে সহ্য করিতে পারে না। লক্ষ্মী আসিলে তবু একটু ভালো লাগে।

বাবার সেই প্রকাণ্ড বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসে, অনেক কথাই বুঝিতে পারে না, কিন্তু ছাড়িয়া উঠিতেও পারে না। রাজকুমারীরা সব সার বাঁধিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, অর্দ্ধ-পরিচয়ের অবগুণ্ঠনে তাহাদের মুখে একটি আবরণ পড়িয়া গেছে; তাহা উত্তোলন করিতে পারে, এমন সামর্থ্য সাগরের নাই। না-ই থাকিল, তবু সাগর চেষ্টার ক্রটি করে না, চেষ্টাতেই সুখ পায়।

অনেক সময় নিতান্ত হতাশ হইয়া, এই বইগুলি যাহার লেখা তাহার ছবিখানার দিকে অপলক দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মোটাসোটা, মাথায় টাক-পড়া অথচ দাড়ি-গোঁফসংযুক্ত, জম্‌কালো পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক—নাম উইলিয়াম্ শেইক্স্‌-পীয়্যর্। উহার নাম সে বাবার মুখে বহুবার শুনিয়াছে, এ-

নামটি তাহার বাবা এমন ভাবে উচ্চারণ করিতেন, যেন উহা কোনো মানুষের নাম নয়, উহা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে যেন অচিন্ত্য ও অনিন্দ্য একটা-কিছু ঘটিয়া যাইবে, আলাদিনের আশ্চর্য্য-প্রদীপে ঘষা দিলেই যেমনটি ঘটিত! সাগর অনেক সময় একা-একা বসিয়া বাবার মত করিয়া সে-নামটি উচ্চারণ করিয়াই সেই অঘটন-সংঘটনের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া উঠিত, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই তো ঘটিল না! সাগর ভাবিত, সে অনেক পাপ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় দেবতারা তাহার প্রতি অপ্রসন্ন, নতুবা ঐ নামের মধ্যে যে একটা জাদু রহিয়াছে, এ-কথা মনে-প্রাণে সে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করিত।

শেইক্‌স্‌পীয়্যরের ছবির দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে সাগর ভাবিত, এমনও তো হইতে পারে যে ছবিখানা হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে সব কথা জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গেল! ইনি নাকি বহুদিন যাবৎ মারা গিয়াছেন, এখন স্বর্গ হইতে তাঁহার আত্মা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছে যে একটি বিদেশী ছোট ছেলে তাঁহার বই পড়িয়া বুঝিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ব্যর্থ হইতেছে। দেখিয়া কি তাঁহার দয়াও হয় না?···সাগর উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া রাখিত, এই বুঝি ছবির ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। হয়-তো ঠোঁট সত্যই নড়িয়াছে, কিন্তু সাধারণ লোক বলিয়া কোনো কথাই সে শুনিতে পায় নাই।

আর্দ্রচিত্তে সাগর প্রার্থনা করিত, হে ঈশ্বর, তুমি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কোরো।

রাত্রিবেলা লণ্ঠনের আলোয় বসিয়া সাগরের মনে হইত, সুমুখের খোলা জানালা দিয়া ঠিক এই মুহূর্তে শেইক্‌স্‌পীয়্যরের আত্মা যদি তাঁহার জীবৎ-কালের মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়ে, ও দুর্ব্বোধ্য রহস্যগুলি চক্ষের পলকে একেবারে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে, তাহা হইলে কেমন হয়? বাহিরে একটু-কিছুর শব্দ হইলেই আনন্দে ও ঈষৎ ভয়ে তাহার গা কাঁটা দিয়া উঠিত।

সাগর বলিল, ত্যাখ্‌ লক্ষ্মী. আমি ভুল বলেছিলাম. মালিনীর মেয়ে ও নয়।

লক্ষ্মী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল. কা'র কথা বল্‌ছ?

সাগর অভিমানিত হইয়া বইটার পাতা খুলিয়া বলিল, এই যে।

ছবিটা দেখিয়াও লক্ষ্মীর কিছু মনে পড়িল না। তবু, সাগরের মন রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিল, মালিনীর মেয়ে নয় তো কি হয়েছে?

লক্ষ্মীর বোকামিতে সাগর রীতিমত চটিয়া গেল। উষ্ণকণ্ঠে বলিল, হ'বে আবার কি ছাই? আমি একদিন তোকে বলে-ছিলাম না?

লক্ষ্মী শতচেষ্টা করিয়াও কিছুতেই মনে আনিতে না পারিয়া কহিল, কি বলেছিলি রে? কবে?

লক্ষ্মীর মুখ সাগরের হাতের খুব কাছেই ছিল। অসহিষ্ণু

হইয়া সাগর সেখানে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। বলিল, বোকা কোথাকার!

লক্ষ্মীর কান দুইটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল, সমস্ত মুখ ভরিয়া প্রায় দুই মিনিট্ ধরিয়া অসংখ্য আল্‌পিন্ ফুটিল; তারপর সারাটা গলা বুজাইয়া দিয়া কি যেন কতগুলো উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, মুখের মধ্যে নোনা স্বাদ পাইল, চোখ দুইটা ভিজিয়া আসিল, এবং দু'টি ঠোঁট ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষ্মী তখন এক ছুটে সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্ত-মধ্যে সাগরের মন সকল সৃষ্টির প্রতি বিমুখ, বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ঐ কুসুমশায়িতাকে দেখিয়া সে যতদিন যত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছে, ঐ এক মুহূর্ত্তে সে-সমস্ত বিস্বাদ, বিষ-তিক্ত হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল, ঐ ছবিটাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু কেন লক্ষ্মী বুঝিল না? কেন লক্ষ্মী ভুলিয়া গেল? অথচ, লক্ষ্মীর কাছে মিথ্যা কহিয়াছে বলিয়া এতদিন ধরিয়া সে নিজকে ধিক্কার দিয়া আসিয়াছে, কতদিনে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়া লক্ষ্মীর কাছে বলিয়া নিজের অপরাধ স্খালন করিতে পারিবে, সেই আশায় ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে;—আর আজ যখন সেই দিন আসিল, তখন লক্ষ্মী কিনা সব ভুলিয়া গেল, তাহার কথা একটুও বুঝিল না, এবং তাহা স্বীকার করিতেও লেশমাত্র লজ্জা-বোধ করিল না! সে লক্ষ্মীকে মারিয়াছে, বেশ করিয়াছে; এখন কাছে পাইলে আবার মারে। বোকা মেয়ে!

মলিনা ঘরে ঢুকিয়া কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য কঠোরতা আনিয়া কহিল, তুই লক্ষ্মীকে মেরেছিস্ ?

—হ্যাঁ। বেশ করেছি। আবার মার্‌ব।

মলিনা কঠোরতর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তুই কেন ওকে মার্‌তে গেলি ?

—মার্‌ব না ! ও কেন ভুলে' গেল ? বলিয়া সাগর মুখ ফিরাইয়া লইল।

—কি ভুলে' গেছে ?

সাগর কোনো কথা কহিল না।

মলিনা আবার বলিল, বল্ না কি হয়েছে !

কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও মলিনা ছেলের মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির করাইতে পারিল না। সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া মুখটা বর্ষার আকাশের চেয়েও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল, কিন্তু কথা আর একটিও কহিল না।

সমস্ত দিন সাগর প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ টানিতে লাগিল। বিকালে তাহার বাবা আফিস্ হইতে ফিরিলে পর সাগর হাত হইতে একটি চায়ের পেয়ালা ফেলিয়া দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। মা তাহাকে কখনোই মারিবে না, সাগর তাহা জানিত, কিন্তু বাবার কথা বলা যায় না। আশান্বিত দৃষ্টিতে সে বাবার দিকে চাহিল ; ব্যোমকেশ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভাঙ্‌ল তো পেয়ালাটা ! তারপরেই সাধারণ স্বরে মলিনাকে :

হরিমতিকে বলো, এখুনি ঘরটা ঝাঁট্ দিয়ে ফেলুক্, নইলে পায়ে ফুটবে হয়-তো।

দুরদৃষ্ট সাগরের! তাহার ইচ্ছা হইল, বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দেয়, কিম্বা বাবার সিগারেটের কৌটা জলে ফেলিয়া দেয়, তবু যদি সে একটু মার খাইয়া বাঁচে! ঐ মৃদু বকুনিটুকু সম্বল করিয়া সে নিজকে যথাসম্ভব দুঃখী কল্পনা করিয়া নানারূপ বিলাস করিল, কিন্তু চোখে কিছুতেই জল আনিতে পারিল না।

কিন্তু রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে সান্ত্বনা আসিল। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া মা তাহার চুলে বিলি কাটিতে-কাটিতে যেই ডাকিল, সাগর! অমনি সাগর বলিয়া উঠিল, ও কেন ভুলে' গেল মা, ও কেন ভুলে' গেল? বলিয়াই মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া নিতান্ত অসহায়ের করুণ আত্ম-সমর্পণের কান্না কাঁদিতে লাগিল।

সাগর বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ও কেন ভুলে' গেল, কেন ভুলে' গেল, কেন ভুলে' গেল?

বলিয়া আরও, আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী রাগ করিয়া কিছুদিন আর আসিল না, কিন্তু একদিন তাহাকে আসিতেই হইল।

বিকালের দিকে একজন মহিলা মলিনার কাছে বেড়াইতে আসিলেন। মহিলাটি ঘরে ঢোকা মাত্রই এক তীব্র সুগন্ধে সাগরের সবগুলি স্নায়ু অবশ হইয়া আসিল। তিনি যতক্ষণ বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, সাগর এক কোণ হইতে আড়-চোখে তাঁহাকে বার বার দেখিতেছিল। দু'টি বাহু এত

শুভ্র ও কোমল বলিয়া সাগর দৃষ্টি দিয়া অনুভব করিল যে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন এই দৃষ্টির আঘাতটুকুও সেখানে সহিবে না! থোবা-থোবা রঙীন ফুল-আঁকা শীতল শাড়িটি দেখিয়া সাগরের আবার সেই ছবিটা মনে পড়িয়া গেল।

ভদ্রমহিলা বিদায় নিয়া দরজার দিকে আগাইতেছেন, এমন সময় সাগর সেইদিকে চলিতে-চলিতে হঠাৎ চৌকাঠে হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল। মহিলাটি লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া নুইয়া পড়িয়া সাগরকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া মলিনার দিকে ক্ষমাভিক্ষু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আমার দোষেই পড়্‌লো বুঝি! ছি, ছি, কোথায় লেগেছে বলো তো খোকা।

বলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সাগরকে তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে ভরিয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সাগর অম্লানবদনে কহিল, আমার নাম সাগর।

—সাগর? বাঃ, সুন্দর নাম তো তোমার! আচ্ছা সাগর, খুব লেগেছে?

সাগর চুল দুলাইয়া বলিয়া উঠিল, নাঃ, কিচ্ছু লাগে নি।

অথচ কাঠের ঘষা লাগিয়া হাতের খানিকটা যে ছড়িয়া গিয়াছে, তাহা সাগর আদৌ টের পায় নাই। মহিলাটি তাহা দেখিয়া বলিলেন, এই তো এখানটায় ছড়ে' গেছে। তুমি খুব তো বীরপুরুষ দেখ্‌ছি! বলিয়া আহত স্থানটিতে খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে তাহার গালের উপর নিজের গাল রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এখন মা-র কাছে যাও—কেমন? একদিন মা-র সঙ্গে আমাদের বাড়ি বেড়াতে যেয়ো—যাবে?

তীব্র সুগন্ধ ক্রমানুক্রমিক সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সাগরের নিঃশ্বাস হরণ করিয়া লইবার উপক্রম করিল, সে অতি কষ্টে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

সন্ধ্যা না হইতেই লক্ষ্মী খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কহিল, সাগর, তুই নাকি পড়ে' গিয়ে চোট্ পেয়েছিস্?

সাগর তাহার জাম্-বাক-মাখা হাতখানা দেখাইয়া উত্তর দিল, তেমন-কিছু নয়।

মলিনা হাসিমুখে বলিল, সাগর আজকাল ভয়ানক দুষ্টু হ'য়ে উঠেছে, না রে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী সে-দিনের কথা ভাবিয়া লাল হইয়া উঠিল, কোনো কথা বলিতে পারিল না।

এ-অবস্থায় সাগর যাহা বলা সঙ্গত বিবেচনা করিল, তাহাই বলিল, আমার শিয়রে এসে বোসো লক্ষ্মী, আমার যে অসুখ করেছে!

লক্ষ্মী মেয়ের মতো লক্ষ্মী তাহাই করিল।

মলিনা বলিল, বুঝ্‌লি লক্ষ্মী, বিকেলে একজন বেড়াতে এসেছিলেন, তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক এম্‌নি সময়ে সাগরও আছাড় খেল। ছেলে পড়েছে নিজের দোষে, অথচ উনি ভাব্‌লেন, ওঁর বুঝি—! কী অন্যায় ভ্যাখ্ তো লক্ষ্মী।

একটি অম্লান হাসির মধুর বিস্তারে সাগরের চোখ বুজিয়া আসিল। বালিশের নীচে লক্ষ্মীর হাত দু'টি টানিয়া নিয়া নিজের অক্ষত হাতের আঙুলগুলি দিয়া খেলা করিতে লাগিল।

সাড়া

মলিনা বাহিরে যাওয়া মাত্র সাগর লক্ষ্মীর মুখটা জোর করিয়া বালিশের উপর ফেলিয়া তাহার কানে-কানে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জানিস্ লক্ষ্মী, আমি ইচ্ছে করে' পড়ে' গিয়েছিলাম! একটুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া পরে বলিল, নইলে তুমিও তো আজ আস্তে না লক্ষ্মী, আরো কয়েকদিন হয়-তো রাগ করে' থাক্তে।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার:

সেদিন খুব লেগেছিল নাকি রে?

বালিশের নীচে লক্ষ্মীর দুইখানা ও সাগরের একখানা হাত ঘামে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

৪

রাত্রি আটটা না বাজিতেই ঘুমাইয়া পড়া ছিল সাগরের নিয়ম, কিন্তু আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। হাতের যন্ত্রণার জন্যই হোক্ বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক্, সে বিছানায় শুইয়া কেবলই উস্‌খুস্ করিতে লাগিল; হাত পা নাড়িয়া, কাশিয়া বা উঃ-আঃ বলিয়া সে দু'মিনিট্ পর-পরই মা-কে জানাইয়া দিতেছিল যে সে এখনো ঘুমায় নাই। মলিনা কহিল, তোর কি-হ'ল আজ? গরম লাগ্‌ছে?

তারপর একখানা হাত-পাখা লইয়া হাওয়া করিতে করিতে:

নে, এখন ঘুমো।

তবু পাঁচ মিনিট্ পরে সাগর আবার বলিয়া উঠিল, উঃ।

মলিনা আরো জোরে পাখা চালাইতে লাগিল।

এবারে সাগর বলিল, পাখাটা রেখে দাও মা। ভালো লাগ্‌ছে না।

এতক্ষণে মলিনা ছেলের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সাগরের আঙুলগুলি মট্‌কাইয়া দিতে-দিতে কহিল, তুই এত বড় হ'লি, এখনো আমার সঙ্গে না শু'লে ঘুম হয় না—কী হ'বে তোর? বড় হ'লে আমাকে ছেড়ে তো থাক্‌তে হ'বে।

কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া সাগরের মন খুসিতে নাচিয়া উঠিল। প্রবল ভাবে কহিল, ইস্‌স্!

—ইস্‌স্ না তো কি। কাল থেকে ঐ পাশের ঘরে তোকে ছোট বিছ্‌না করে' দেবো। সেইখেনে একা শুবি।

সাগর চুল ঝাঁকাইয়া, পা ছুঁড়িয়া, হাত দিয়া মায়ের গালে

চিম্‌টি কাটিতে-কাটিতে বলিল, শোব না, শোব না, শোব না—ককখনো শোব না। দেখে নিয়ো তুমি।

—আচ্ছা সাগর, তুই যখন খুউব বড় হবি, তখন আমি মরে' যাবে তো? তখন?

ততদিনে সাগর এইটুকু বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইয়াছে যে সে-ও একদিন বড় হইবে, বাবার মত ছড়ি হাতে নিয়া বেড়াইবে, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইবে। তাই দুর্ব্বল স্বরে কহিল, না, তুমি মর্‌বে না, মর্‌তে পার্‌বে না।

—তা কি হয় রে সাগর? মর্‌তে সবাইকেই হয়, আমিও মর্‌ব।

—মরো না একবার, তোমায় দেখাব মজাটা!—তারপর একবার উবু হইয়া আবার পাশ ফিরিয়া মায়ের ঠোঁট দুইটি হাত দিয়া নাড়িতে-নাড়িতে:

বলো মা বলো, তুমি মর্‌বে না?

মলিনা ছেলের কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতা উপেক্ষা করিয়া কহিল, মর্‌বই তো। একা-একা শুতে ভয় কর্‌বে তোর?

ছেলে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল, করবেই তো;—তোমাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও—

সাগরের গলা ধরিয়া আসিল।

মলিনা সান্ত্বনাচ্ছলে কহিল, কেন, তখন তোর রাঙা-বৌ আস্‌বে, তা'র সঙ্গে শু'বি।

সাগর মায়ের হাঁটুর নীচে এক প্রচণ্ড লাথি মারিয়া নাকীসুরে বলিয়া উঠিল, চাই নে রাঙা-বৌ।

মলিনা অগত্যা হার মানিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, আমি মর্‌ব না! এখন ঘুমো দিকিনি।

মায়ের মুখের এই কথা শুনিবার পর সাগরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজভাবে বহিতে সুরু করিল, পুলকিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, হঁ্যা মা, বড় হ'য়ে আমি মস্ত একটা বাড়ি কর্‌ব, সেখানে তোমাকে নিয়ে থাক্‌ব।

—আর তোর বাবা? তাঁর কি হ'বে?

সাগর ক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারণ করিল, তিনিও থাক্‌বেন। পরে একটু ভাবিয়া লইয়া:

তিনি বাড়ি পাহারা দেবেন, যা'তে চোর-ডাকাত না আস্‌তে পারে।

—আর তুমি? তুমি কি কর্‌বে?

সাগর গম্ভীরভাবে কহিল, বই লিখ্‌ব।

—বই লিখ্‌বি? কে পড়্‌বে?

কথাটা সাগর মায়ের কানের সঙ্গে মুখ আট্‌কাইয়া কহিল। মলিনা ছেলের যশোলিপ্সার পরিধির স্বল্পতা দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল।

যে-শনিবার হরনাথ বাবুর বদলির খবর আসিল, সেদিন সাগর দশ-বছর ছাড়াইয়া কয়েক মাস আগাইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার রাত্রি এগারোটার ট্রেইনে তাহাদিগকে নোয়াখালি ছাড়িয়া রাজসাহী রওনা হইতে হইবে।

পরের দিন ভাদ্রমাসের অমাবস্যা, দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে গুজব শোনা যাইতেছে যে, এবার যে-'শর' আসিতেছে, তাহার মত সুন্দর ও ভয়ঙ্কর ইতিপূর্ব্বে নাকি আর কোনো বছরেই আসে নাই। দুই দিন যাবৎ শহরের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে, ছেলে-বুড়ার মুখে এই অতি-আসন্ন শোভার দুরন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া ফিরিতেছে।

একে রবিবার, তাহার উপর আকাশ সকাল হইতেই একেবারে ঝক্‌মকে পরিষ্কার; ভাদ্রের প্রখর রৌদ্রে জোয়ারের প্রবল জোয়ার কেমন ফুলিয়া-ফুলিয়া দুলিয়া উঠিবে, সকালে চায়ের টেবিলে সাগর মা-বাবার মুখে এই আলোচনা শুনিল। কিন্তু শুনিয়াই ভুলিয়া গেল, কারণ, লক্ষ্মী না থাকিলে তাহার দিনে ও রাত্রিতে যে একটা ফাঁকা আসিবে, তাহা ভরিয়া তুলিবার কোনো উপায় আছে কিনা, সাগরের মন তখন তাহাই সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। আজ যে রবিবার, এ-সত্যটি নিতান্তই শুভ ও সুখের বলিয়া ব্যোমকেশ যখন ঘোষণা করিল, সাগরের মন তখন-চট্ করিয়া হিসাব করিয়া ফেলিল—রবি, সোম—মঙ্গলের ও সমস্তটা দিন। লক্ষ্মী নাই, অথচ সে আছে, নিজের এ-অবস্থা কল্পনা করিতে সে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, নর-দেহের রক্ত আর মাংসের মত উহারা দুইজনে যেন পরস্পরের

সঙ্গে এমন নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ যে, কোনো শাইলক্ একটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিলে ঠকিয়া যাইবে।

উপমাটি মনে করিয়া সে ক্ষণিকের আরাম পাইল, কিন্তু তাহার সাধারণ বুদ্ধি তাহাকে বলিল যে সুন্দর উপমার বাঁধ বাঁধিয়া নদীস্রোতকে আটকাইয়া রাখা যায় না। অথচ, লক্ষ্মীর সঙ্গে ব্যবধানটা মানিয়া লইবার মত সাহসও নিজের মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সমস্তটা দিন একা-একা সে কি করিবে? সন্ধ্যাটা কেমন করিয়া কাটাইবে? বই পড়িয়া গল্প বলিবে কাহার কাছে? সাগরের বই লিখিবার সঙ্কল্প শতখণ্ড হইয়া উনপঞ্চাশ বায়ুতে ধূলা হইয়া মিশিয়া গেল।

যে-হরিণী নিজে চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ব্যাধের আক্রমণকে এড়াইবে বলিয়া আশা করে, ঠিক তাহারি মত সাগর কথাটা একরকম জোর করিয়াই বিশ্বাস করিল না, কিম্বা ইহা বিশ্বাস করিল যে, এখনো এমন একটা কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত হয়-তো লক্ষ্মীদের যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিবে না।

একটার সময় 'শর' আসিবে, কিন্তু বেলা দশটা হইতে নদী-তীরে নানা বয়সের ও অবস্থার নর-নারী জড়ো হইতে সুরু করিয়াছে। উগ্র রৌদ্রালোকে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতেছে, তাপদগ্ধ মুমূর্ষু আকাশ আপনার চারিদিকে একখানি নীলিম ক্লান্তি টানিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণাকৃতি নদীটির যেন আর তর সহিতেছে না, তাহার শীর্ণ তনুর সকল দারিদ্র্য অপসারিত

করিয়া জোয়ারের জল কখন্ যে অসীম ঐশ্বর্যে তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সাড়ে-বারোটার সময় নদীতীরবর্তী একটি ঝাউগাছের ছায়ায় সাগর ও লক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই শান্তাসীতার মোড় হইতে বিশাল ঢেউগুলি কেমন করিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, তটভূমিকে চুরমার্ করিয়া দিয়া সহস্র রক্তোন্মত্ত রণ-তুরঙ্গের মতো আসিয়া উল্কার বেগে ছুটিয়া যাইবে, তাহা সেখান হইতে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাওয়ার কথা।

সাগরের চোখে কিন্তু কিছুই পড়িল না। লক্ষ্মী আজ সাবান দিয়া চুল ধুইয়া মাথার উপর গাঢ় বাদামী রঙের একটা ঢেউকে চওড়া লাল ফিতা দিয়া বাঁধিয়া আসিয়াছে। লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়াইয়া নদীর দিকে তাকাইয়া রহিলেও, সেই লাল ফিতার একটু অংশ সাগরের সমস্ত দৃষ্টি দখল করিয়া বসিল। বাতাসে সেই ফিতাটুকু বার-বার উড়িয়া আসিয়া সাগরের নাসিকার অগ্রভাগ ছোঁয়-ছোঁয় করিয়াও সরিয়া যাইতেছিল, আর মুহূর্তের জন্য সাগর ল্যাভেণ্ডারের শীতল গন্ধে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। বুধবার হইতে আর সে লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবে না, এ-কথা সহসা মনে পড়িয়া গিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় সাগরের বুকের কল-কব্জাগুলি যেন মোচড় দিয়া উঠিল। যাওয়ার দিন লক্ষ্মী নিশ্চয়ই খুব কাঁদিবে। মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, সে-ও কাঁদিলে ব্যাপারটি বেশ জমিয়া উঠিতে পারে।

আসন্ন শূন্যতার অপরিসীম ক্লান্তিকে সে যেন চোখের জল ঢালিয়া-ঢালিয়া পরিপূর্ণ করিয়া নিতে চায়।

কথাটা ভাবিয়া সাগর তখনকার মত একটু স্বস্তি বোধ করিল। আবার সেই লাল ফিতাটুকু তাহার নাকের সাম্‌নে একবার তুলিয়াই সরিয়া গেল। সহসা চারিদিক হইতে একটা তুমুল কলরোল শোনা গেল—আস্‌ছে, আস্‌ছে। সাগর চাহিয়া দেখিল, রাশি-রাশি লাল ফিতা পর্ব্বতশ্রেণীর মত দীর্ঘ হইয়া ঝড়ের মুখে উড়িয়া আসিতেছে। আকাশের গায়ে অসংখ্য লাল ফিতা সাপের মত পেঁচাইয়া-পেঁচাইয়া অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, আর পৃথিবীর বাতাসে একটি শীতল সুগন্ধ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া সাগরের চোখে জল আসিল না দেখিয়া সাগর অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। এখনো কি চিরকালের মত হাসিয়া সাধারণ কথা-বার্ত্তা কহিতে হইবে? এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাগরের সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। অনেকগুলি অসাধারণ কথা তাহার মাথায় আসিল, কিন্তু লক্ষ্মীর দিক হইতে কোনো উৎসাহ না পাওয়ায় বলিতে পারিল না। এমন কি লক্ষ্মী —বোকা মেয়ে!—এ-কথাও কহিল না, আগামী বচ্ছর এ-দিনে কোথায় থাকি, কে জানে?

বরঞ্চ প্রতিদিনকার মতোই জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগ্‌ল রে সাগর?

রাগে সাগরের গা জ্বলিয়া গেল। আর যখন দুইদিন মাত্র সময় হাতে আছে, তখন এই সব তুচ্ছ প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগকে অপব্যয় না করিলে কি লক্ষ্মীর চলিত না? তাহার চোখে তখনো লাল ফিতার ম্যাজিক্ চলিতেছিল, কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, কে জানে ছাই কেমন লাগ্‌ল!

লক্ষ্মী বিস্মিত দুইটি চোখ সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া সাগরের মুখের উপর রাখিল। সেই মুহূর্ত্তে সাগর একটা জিনিষ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, লক্ষ্মীর সমস্ত মুখের মধ্যে দুইটি চোখ ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রকাণ্ড দুইটি চোখ নিজেদের পরিপূর্ণতার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া টলমল করিতেছে—দুইটি নির্ঝরিণী চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া দুইটি হ্রদে পরিণত হইয়াছে, সেই হ্রদ দুইটি কূলে-কূলে কালো জলে টলমল করিতেছে —এই যেন ছাপাইয়া যাইবে!

সাগর ভাবিল, এই মুখখানা নিয়া সে কি করিবে?—এই মুখ, যাহা শুধুই এক জোড়া কালো চোখে ভরিয়া গিয়াছে!

লক্ষ্মী নির্ব্বাক্, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, সেই দৃষ্টির স্পর্শমাত্রে যত বড়-বড় কথা সাগর বলিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, সব ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। লক্ষ্মী যে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও সাগর ভুলিয়া গেল বুঝি—এক জোড়া চোখের অবগাঢ় কালিমা তাহার মনের আকাশ হইতে অন্য-সব রঙ্ নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া গেল।

মঙ্গলবার সমস্ত দুপুর ভরিয়া তাহাদের নিত্যকার ছবি-দেখা ও আলোচনার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না; শুধু যাইবার সময় লক্ষ্মী বলিল, স্‌টেশ্‌নে যাস্ রে সাগর, খুব মজা হ'বে।

রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত সাগর স্‌টেশ্‌নে যাওয়া নিয়া খুব নাচানাচি

করিল, ও সাড়ে-সাতটার সময় ভাত খাইয়া উঠিয়া আটটা পর্য্যন্ত প্রসাধনে ব্যস্ত রহিল। দশটার সময় ব্যোমকেশ ও মলিনা যখন স্টেশনে গেল, তখন সাগর সমস্ত কাপড়-চোপড় সুদ্ধই অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, আর লক্ষ্মী ও গাড়ির কাম্‌রার এক কোণে জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

৬

সাগরের দিন আর কাটিতে চাহে না।

পরের দিন সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া যখন তাহার মনে পড়িল যে লক্ষ্মীর কথামত স্টেশনে যাওয়া হয় নাই, তখন সে কাঁদিয়া-কাটিয়া, জিনিষপত্র ভাঙিয়া, জামা ছিঁড়িয়া, আঙুল কামড়াইয়া এক হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিল। মা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন, তখন সে মলিনার মুখে, বুকে, গায়ে এলোপাথাড়ি চড় মারিতে লাগিল। চড় মারিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল—

কেন আমায় নিয়ে গেলে না? কেন আমায় নিয়ে গেলে না? কেন?

মলিনা যাহা-কিছু বলিতে যায়, সাগর তাহার কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠে,

কেন আমায় নিয়ে গেলে না তোমরা? কেন আমায়—

কান্নায় বাকি কথাটা আট্‌কাইয়া আসে।

দুর্ব্বল বালক অতি অল্পক্ষণেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, প্রবল উত্তেজনা ঝড়ের মতো তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা একটি সুস্নিগ্ধ অবসাদের করুণ ক্লান্তি, দেহমনব্যাপী এক সীমাহীন প্রশান্তি মাত্র। সাগর বিছানায় শুইয়া-শুইয়া জীবনের প্রথম দুঃখ দিয়া বিলাস করিতে লাগিল—এই দুঃখের তীব্র অনুভূতিতেই যেন লক্ষ্মীর বিরহ কানায়-কানায় ভরিয়া গেছে!

মলিনা আসিয়া ডাকিল, স্নান কর্‌বি নে?

— না।

সাড়া

—খাবি নে ?

—না।

মলিনা আর পীড়াপীড়ি করিল না।

দুপুরবেলায় নারিকেল-পাতার মর্ম্মর-ধ্বনিতে যখন বিশ্রামের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি উদাস হইয়া উঠিয়াছে, অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় মলিনা আসিয়া দেখিল, সাগর বালিশটাকে দুই হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার চোখের কোল কালো, মুখখানা নিতান্ত মলিন। যে-রাত্রে সাগর স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, মলিনার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ছেলের পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল ; ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ভাবিতে লাগিল, সাগর বড় হইয়া অনেক বই লিখিবে, বিশ্বব্যাপী যশ তাহার পায়ের নীচে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে। তখন কত লোক তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে, ভালোবাসিবে—কিন্তু জীবনে প্রথম তাহাকে যে ভালোবাসিল, সেই মায়ের কথা সে নিজেও হয়-তো মনে রাখিবে না।

সাগর ঘুমের মধ্যেই ডাকিয়া উঠিল, মা।

কি রে ?

সাগর চোখ মেলিয়া মায়ের শুষ্ক চোখ মুখ দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্নান করো নি মা ? খাও নি ?

তোর ক্ষিদে পেয়েছে ? চল্, খেয়ে আসি।

মুহূর্ত্তমধ্যে সাগরের সব মনে পড়িয়া গেল। সাগর, ছোট ছেলে সাগর, যে-বয়সে মানুষ সখ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, সেই বয়সের সাগর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার চোখ বুজিল।

চোখ বুজিয়া শুনিতে পাইল, তোর কি হয়েছে রে সাগর ?

সাগরের সমস্ত গা কাঁটা দিয়া উঠিল। ঐ রকম আদরের সুরে একজনই তাহাকে ডাকিত। আর একটু হইলেই সে কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত।

মলিনা আবার ডাকিল, সাগর।

সাগর চোখ মেলিল।

মলিনা কহিল, ছিঃ সাগর, যা'রা বই লিখ্‌বে, তা'দের কি অমন কাঁদ্‌তে আছে ? তা'রা অন্যকে কাঁদাবে, নিজেরা কেঁদে ফেল্‌লে আর লিখ বে কি ?

সাগর প্রতিবাদ করিল, আমি বই লিখ্‌ব না।

—পাগ্‌লা ! লিখ্‌বি নে কেন ? বই যা'রা লেখে, ঈশ্বর তা'দের কত ভালোবাসেন !

—ঈশ্বর না ছাই !

—এক কাজ কর্ সাগর। তুই নিজে একটা বাড়ি কর্—

—না, বাড়ি আমি কর্‌ব না। কিচ্ছু না।

ছেলের হৃদয়ের কোন্‌খানটায় স্পর্শ করিলে যে ঠিক ভাঙাটা জোড়া লাগিয়া যাইবে, অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে-হাত্‌ড়াইতে মলিনা তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। স্নান না করায় ও না খাওয়াতে সে-ও দুর্ব্বল, অবসন্ন বোধ করিতেছিল, তাই ছেলেকে আর না ঘাঁটানোই সে বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিল। সহসা দ্বিপ্রহরের উদাসীন স্থিরতা আলোড়িত করিয়া কোথা হইতে এক ঘূর্ণী বাতাস উঠিল, ঘরের এক জানালা দিয়া এক দমকা শীকরসিক্ত বাতাস বিদ্যুদ্বেগে ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির

হইয়া গেল ;—মুহূর্ত্ত-মধ্যে টেবিল হইতে কাগজপত্র ছড়াইয়া পড়িল, আল্‌নায় ঝুলানো কয়েকখানা কাপড় স্থানচ্যুত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, উঠানে একটা ক্ষুধিত কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই বাতাসের পাখায় ভর করিয়া একটি গানের সুর উড়িয়া আসিয়া মলিনার কণ্ঠে অবতরণ করিল—যে-গান সে বাল্যকালের সখীদের মুখে শুনিয়াছে, এবং যে-গানের কথাগুলি তাহার প্রায় কিছুই মনে নাই। সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল, যত কথা সাগরকে সে আজ কহিতে পারে নাই, সে-সকল কথা, প্রত্যেকটি কথা, সুরের রূপ ধরিয়া তাহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হইতে লাগিল। সে সুরটি গুঞ্জরণ করিতে-করিতে ঘরের সমস্ত বাতাস ভরিয়া একটি মিনতি ছড়াইয়া দিতে লাগিল, ঘুমাও বাছা, ঘুমাও।

অনেকক্ষণ পর সাগর চোখ মেলিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। এই না তাহার মা এখানে শুইয়া ছিলেন ? কিন্তু এ যে—নামটা নিজের মনে-মনেও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিন্তু সমস্ত মুখ-ভরা সেই দুইটি কালো চোখ তাহার চোখের উপর তেম্‌নি মোহ বিস্তার করিয়া ধরিয়াছে। ভয়ে, আনন্দে সে আবার চোখ বুজিল। শেষে, মলিনার কণ্ঠস্বরের সুকোমল সুর-ব্যঞ্জনা একখানি পেলব স্পর্শের মতো তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া গেল।

৭

একদিন সেই ঘুম-পাড়ানি গান থামিয়া গেল। সাগরের তখন বারো চলিতেছে।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় ;—একদিন বিকালে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবার সময় মলিনা হোঁচট্ খাইয়া বাঁ পায়ের কড়ে’ আঙুলে একটু চোট্ পাইল। সেই রাত্রেই আঙুলটা একটু ফুলিয়া সামান্য যন্ত্রণা দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে ব্যোমকেশ ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তারের দেওয়া কি একটা ওষুধ মাখানোর ফলে তাহা চট্ করিয়া সারিয়াও গেল। কিন্তু তিন-চার দিন পরে এক প্রাতঃকালে মলিনার ঘুম ভাঙিল বটে, কিন্তু সে শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না. তাহার সমস্ত বাঁ পা-টা ফুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে। ব্যোমকেশ সিভিল্ সার্জ্জন্ হইতে আরম্ভ করিয়া হোমিওপ্যাথ্ ননীবাবু পর্য্যন্ত কাহাকেও আনাইতে ত্রুটি করিল না, ঝন্‌ঝন্ করিয়া অনেক-গুলি টাকা ও সেই সঙ্গে নিঃশব্দে মলিনার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সাগর দেখিল, সমস্তটা আকাশ একটা নীল পাথরের ছাদের মতো ধীরে-ধীরে তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিতেছে, ও চারিদিক হইতে মাটি খাড়া হইয়া উঠিয়া আসিয়া কঠোর প্রাচীরের মত তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। চোখে তাহার এক ফোঁটাও জল আসিল না।

কাকস্নান

১

প্রাইভেট্ পরীক্ষা দিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সাগর কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। ব্যোমকেশ অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া মির্জাপুর ও কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে মিশ্‌নারী প্রতিষ্ঠিত একটি ছোটখাটো হস্‌টেল্ তাহার জন্য ঠিক করিয়া দিয়া গেল। সাগর বাবাকে তুলিয়া দিতে শিয়ালদহ স্‌টেশ্‌নে গিয়া এক নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ফিরিল। ট্রেইন্ যখন ছাড়িয়া দিয়াছে, ব্যোমকেশ তাহার কাম্‌রার জান্‌লা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হঠাৎ সাগরের চুলগুলির উপর পর-পর কয়েকটা সশব্দ চুমা দিয়া ফেলিল। তারপরেই গাড়ির হেঁচ্‌কা টানে দুইজনকে বিছিন্ন করিয়া দিল।

একটা বাস্-এ চড়িয়া হস্‌টেল্-এ ফিরিতে-ফিরিতে সাগরের সমস্ত শরীর ও মন যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। হস্‌টেল্-এর ছোট, প্রায়ান্ধকার, শস্তা জিনিষপত্রে ঠাসা ঘরটি মনে করিয়া তাহার কান্না পাইল। অতটুকু ঘরে তো সে ধরিবে না! নদীকল্লোল বা নারিকেল-পাতার মর্ম্মরের মধ্যে নিজের সত্তাকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারার সৌভাগ্যও তাহার মুছিয়া গেছে। অনেকখানি আকাশ ভোগ করিবার উপায়ও আর নাই, অত বড় আকাশটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া এক-একটি ক্ষুদ্র খণ্ড প্রত্যেক লোকের পাতে পরিবেষণ করা হইতেছে—তা-ও সেদিকে অনেকেরই রুচি নাই।

বাহিরে তাকাইয়া আকাশের তারা দেখিবার চেষ্টা করিয়া সাগর শুধু গ্যাসের আলোই দেখিল।

হস্‌টেল্-এর সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে উঠিতে-উঠিতে

মাঝখানে সাগর দেখিল, সেই ভদ্রলোক—ভদ্রলোকের নামটি সে এখনো জানিতে পারে নাই, তাই নিজের কাছেও ঐ বলিয়াই পরিচয় দিত—বাঁ হাত দিয়া বাঁ গালের উপর একটা রুমাল চাপিয়া ও অন্য হাত দিয়া রেলিঙ্ ধরিতে-ধরিতে অসমান পদক্ষেপে নামিয়া আসিতেছে। সাগরকে দেখিয়া বলিল, এই যে। এতক্ষণে ফির্‌লেন ?

সাগর পাশ কাটিয়া চলিতে-চলিতে বলিয়া গেল, হ্যাঁ।

সাগর যখন দোতালায় উঠিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকটি তখন নিম্নতম সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া মুখ ঘুরাইয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, এইমাত্র একটা বোল্‌তায় কাম্‌ড়ালে—যা জ্বল্‌ছে !

সাগর বিব্রত বোধ করিল। ঐ কথা বলিয়া ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একটু সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে, একটা কিছু না বলিলে সাগরের পক্ষে ভালো দেখায় না, অথচ কোনো মানুষের সাহচর্য্যের বিরুদ্ধে এক্ষণে সাগরের সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ দ্বিধার পর সাগর বলিয়াই ফেলিল, তাই নাকি ? তা এক কাজ করুন্—

কিন্তু ঐখানেই থামিতে হইল। চাহিয়া দেখিল, যাহার উদ্দেশে কথাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, সে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সাগর একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু বিস্ময়টাকেও বেশিক্ষণ আমল দিতে সাহসী হইল না, পাছে সেই চিন্তা তাহার মনের বর্ত্তমান অবসাদের বেদনাকে মুছিয়া ফেলে।

ঘরে ঢুকিতে সাগরের পা সরিতেছিল না, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরকার অবস্থাটা জল্পনা করিতে-করিতে

তাহার দুঃখকে সে উগ্রতর করিয়া লইল। আধখানা ঘর, একপাশে চিপা একটা খাট, টেবিল-চেয়ার সব শক্ত মজ্‌বুত, তাহার উপর আবার বার্ণিশ্‌-করা নয়। মেঝে বলিতে যে দেড় গজ খানেক জায়গা বুঝায়, সেখানে জিনিষপত্র সব ছত্রখান্ হইয়া আছে ;—বিছানা এখনো পাতা হয় নাই, মশারিটা না হয় না টানাইলেও চলিবে। সাগরের সমস্ত মন ভাঙিয়া পড়িল ; সে ভাবিতে লাগিল, এই রাত্রেই কলিকাতা ছাড়িয়া কোনো দিকে উধাও হইয়া যাওয়া যায় কিনা।

—কি, চাবি হারিয়েছে নাকি ?

ভদ্রলোকটি স্নানান্তে খালি গায়ে, লুঙ্গির মতো করিয়া কাপড় জড়াইয়া ও ভিজা গামছাখানা বাঁ গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিজের ঘরের দিকেই যাইতেছিল। সাগর আম্‌তা-আম্‌তা করিল, না, তবে কিনা—এই এম্‌নিই এখানে একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ও। গালটা এখনো জ্বালা কর্‌ছে। বলিয়া গানের সুর ভাঁজিতে-ভাঁজিতে সে নিজের ঘরের দিকে আগাইল।

লোকটার বিরুদ্ধে দারুণ বিতৃষ্ণায় সাগরের সমস্ত গা রি-রি করিয়া উঠিল। এখন সে কাঁদিতে পারিলে বাঁচে, আর ঐ লোকটা কিনা তাহাকে বোল্‌তায় কাম্‌ড়াইয়াছে বলিয়া তাহারই কাছে প্যান্-প্যান্ করিতেছে! ছোাঃ! যেন উহারই উপর রাগ করিয়া সাগর প্রচুর শব্দ করিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিল, ও ঘরের আলো জ্বালাইয়া হুড়্‌মুড়্ করিয়া বালিশ তোষক ইত্যাদিকে খাটের উপর টানিয়া আনিয়া প্রবল বেগে সেই

অপরিচ্ছন্ন শয্যার উপর নিজের দেহটাকে নিক্ষেপ করিল। শীর্ণ খাট সে আঘাতে কোঁকাইয়া উঠিল।

কিন্তু তবু তাহার গায়ের জ্বালা মিটিল না। অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার সহিত বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার বইগুলি বাহির করিতে লাগিল। ট্রাঙ্কটা খুলিতে গিয়া হাতে একটা চিপি খাইয়া সাগর আর-একটু হইলেই 'মা গো' বলিয়া উঠিয়াছিল। সবগুলি বই টানা-হেঁচড়া করিয়া বাহির করিল বটে, কিন্তু কোথায় রাখিবে, তাহা আর ঠাহর পাইল না। হতাশ হইয়া চারিদিকে বইগুলি ছড়াইয়া দিয়া মাঝখানে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

করাইডরে ছট্‌ফট্ আওয়াজ হইল;—দরজার বাহিরে আবার সেই ভদ্রলোককে দেখা গেল। সাগর একবার ভাবিল, সব চেয়ে মোটা বইখানা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া—যেন তাহাকে দেখে নাই, এই ভাণ করিতে লাগিল।

—এখনো শোন্ নি? বইগুলো গুছিয়ে উঠ্‌তে পারছেন না বুঝি? তা' নতুন এলে অমন একটু-আধটু অসুবিধে সবারই হয়, পরে সবই সয়ে' যায়।

সাগর বিদ্যুৎবেগে মুখ ফিরাইয়া ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, ইচ্ছে করে' চার্‌দিকে বইপত্তর ছড়িয়ে বসে' আছি। খুব আরাম লাগে কিনা!

ও, তাই নাকি? ভদ্রলোক মুখখানা অত্যন্ত করুণ করিয়া অনাহূত ভাবেই ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে এমন ভাবে বসিয়া

পড়িল, যাহাতে সগু ধোবাবাড়ি-ফেরৎ পাঞ্জাবীর ইস্ত্রি ভাঙিয়া না যায়।

লোকটার এই গায়ে-পড়িয়া আলাপের চেষ্টা দেখিয়া সাগরের মনে ঘেন্না ধরিয়া গেল। সে তাহার দিকে কয়েকটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দিব্যি কালো রঙ্, অর্থাৎ কিনা বেশ কালো, মানে খুবই কালো। কিন্তু তৈল-মসৃণ, উজ্জ্বল কালো নয়, মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা রুক্ষ পাংশুতা আছে। মুখের চাম্ড়ায় অনেকগুলি বসন্তের দাগ এমন ভাবে বসিয়া গেছে যে কালো রঙের মধ্যে তাহারা প্রায় মিশিয়াই আছে। পাৎলা ঠোঁট দুইটার উপর চোখা নাকটা ঝুলিয়া আছে, দাঁতগুলি বড়-বড় ও অসম্ভব রকম শাদা। নিভাঁজ জামা-কাপড় ধব্ধব্ করিতেছে, পায়ে বর্ম্মী চটি। একটু পরে সাগর খুব মৃদু একটু সেণ্টের গন্ধও পাইল। বাঁ দিকে টেড়িকাটা চুলগুলি ইলেকট্রিক্ আলোয় ঝিলিমিলি করিতেছে।

সাগর মনে-মনে লোকটাকে কুৎসিত আখ্যা দিতে চেষ্টা করিল।

লোকটি পকেট্ হইতে সিগারেট্ বাহির করিয়া বলিল, নিন্ একটা।

সাগর কটুকণ্ঠে উত্তর দিল, মাপ করবেন।

—ও, খান্ না বুঝি? ভালো, ভালো।

বলিয়াই নিজে একটা ধরাইয়া এক টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলিল, চলুন্ বেড়িয়ে আসি।

সাগর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এত রাত্তিরে? ন'টার সময় না গেইট্ বন্ধ হ'য়ে যায়?

আর বন্ধ! বুঝ্লেন মশাই, টাকা থাক্লে স্বর্গের পিটার্ পর্য্যন্ত বাপ বলে' দোর খুলে' দেবে, আর এ তো আমাদের ভজু দারোয়ান্! গাঁজার পয়সাটা মিল্লেই খুসি!

লোকটার কথা কহিবার ভঙ্গী সাগরের আদৌ রুচিগত হইল না। সে বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া কথার সুরটা বদ্লাইয়া নিয়া বলিল, সত্যি, ঘরে যা গরম, রাত্তিরে ঘুমুতে পারেন কিনা সন্দেহ। বরং চলুন্ একটা ট্যাক্সিতে ঘুরে' আসি, মাথা ঠাণ্ডা হ'বে। আউট্‌রাম্ ঘাটে যাবেন?

সাগর সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিল, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ও, তাই নাকি? উঃ, গালটা এখনো টাটাচ্ছে। বুঝ্লেন, বারান্দার ঐ কোণে একটা বোল্‌তার চাক আছে, একটু সাবধান হ'বেন।—কিন্তু বিছ্না-টিছ্না দেখ্ছি এখনো পাতেন নি;—এই বই-ছাড়ানো ঘরে আপনার দম আট্‌কে' আস্‌বে না তো?

সাগর মনে-মনে বলিল, আপনি এখানে আর পাঁচ মিনিট্ থাক্লে আমি সত্যি-সত্যি দম আট্‌কে' মরে' যাবো।

—আপনি বুঝি আবার এ-সব কাজ নিজে কর্‌তে পারেন না? আচ্ছা, আমিই সব ঠিক করে' দিচ্ছি।

সাগর তোত্‌লাইয়া উঠিল, আপনি—আপনি—

সাগরের সুস্পষ্ট উত্তেজনাকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সলজ্জ-ভাবে ঘাড় নোয়াইয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি সব করে'। আপনি একটু সরে' বসুন্।

••

বলিয়া সাগরকে আর কথাটি কহিবার অবকাশ না দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বে যেন বইগুলি গুছাইতে লাগিল। একটিমাত্র শেল্‌ফে সব বই ধরিল না, বাকিগুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে পূরিয়া ট্রাঙ্কটা খাটের নীচে ঠেলিয়া রাখিয়া হাত ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিল, আপনার অনেক দর্‌কারি বই ট্রাঙ্কের ভেতর রয়ে' গেল হয়-তো, কাল সকালে বেছে নেবেন।

একটা চীনা সিল্কের রুমাল দিয়া থাব্‌ড়াইয়া থাব্‌ড়াইয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিল, আপনার এখানে খুব কষ্ট হ'বে হয়-তো। খাওয়ার ব্যবস্থা কেমন বোধ হচ্ছে ?

—মন্দ নয়। সাগর ভাবিল, এ-সব কথাবার্ত্তা লোকটা না বলিলেও পারে।

ততক্ষণে সে তোষকটাকে ভালো করিয়া পাতিয়া তাহার উপর চাদরটাকে বেশ টান্ করিয়া আঁটিয়া দিয়া বালিশ দুইটা বারম্বার ঝাড়িয়া চমৎকার বিছানা পাতিয়া ফেলিল। তারপর ডাকিল, নিন্, এইবার শোন্ এসে।

ততক্ষণে সাগরের রাগ অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। নিজের কাছে সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে অত সব কাজ অমন সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিতে সে পারিত না। সে ভাবিয়াছিল, উহাকে বাধা দিবে, অতি অল্পের জন্যও নিজকে সে উহার কাছে ঋণী করিবে না, কিন্তু কি হইতে কি হইয়া গেল !

—বসে' রইলেন কেন ? আপনার না ঘুম পাচ্ছে ? লোকটি

প্রায় ধমক দিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই নম্রকণ্ঠে কহিল—ও, আপনার মশারি তো টানানো হয় নি।

—থাক্, আপনার আর কষ্ট কর্‌তে হ'বে না।

—এ কষ্টটুকুও আমাকে কর্‌তে হ'বে? বেশ, বেশ। কোথায় আপনার মশারি?

এই রূঢ় কথাগুলিতে সাগর বিরক্ত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ যে কি রকম একটা চিকণ হাসিতে উহার ঠোঁট দুইটা বাঁকিয়াই আছে, বাঁ চোখের নীচে বোল্‌তার কামড়ে ঐ যে একটুখানি ফুলিয়া গিয়া চোখটা একটু ভিতরের দিকে বসিয়া গিয়াছে, ইহারি জন্য যেন উহার মুখে সবই মানাইয়া যায়।

লোকটি মশারি, পেরেক, হাতুড়ির অভাবে একটা কাঠের ফ্রেইম্ ও চারিটা দেয়াল লইয়া অনেকক্ষণ হুড়াযুদ্ধি করিল, তারপর মশারিটা টানাইয়া ফেলিয়া চারিদিক গুঁজিয়াও দিল।

বাঃ, বেশ তো আপনার মশারিখানা। এইবার চট্ করে' ওর ভেতর ঢুকে' পড়ুন্।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

লোকটি বলিল, ইস্, আমার ভারি দেরি হ'য়ে গেল, তারপর ঘরের বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে:

দেখুন্, কাল সকালে যদি আপনার নিজের চা তৈরি করে' খেতে অসুবিধে হয়, তা হ'লে আমার ঘরে যেতে পারেন। আমার ঘর চেনেন্ তো? সাতাশ নম্বর, সাতাশ।

শেষের কথাটা সে নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া পেছন দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

সাগর আলো নিবাইয়া দিয়া ধীরে-ধীরে গিয়া বিছানায় শুইল। তাহার মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। শুইয়া-শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, প্রবল বাতাসের বেগে তাহার চুলগুলি বার-বার উড়িয়া-উড়িয়া মুখে চোখে আসিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই সাম্‌নের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। শেষে অনেক কষ্টে দুই হাত দিয়া চুলগুলি সরাইয়া নিতেই একখানা মুখ সে দেখিতে পাইল;—একখানা মুখ, যাহার মধ্যে দুইটি চোখ ছাড়া আর কিছুই নাই। দুইটি চোখ, কালো চোখ।

২

বেয়াড়া স্‌টোভ্‌টা কিছুতেই জ্বলিতে চাহিতেছে না; সাগর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া উহার সঙ্গে মারামারি করিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় সত্যবান—সাগর এতদিনে ভদ্রলোকের নাম জানিতে পারিয়াছে—সত্যবান, সত্যবান মিত্র, নামের বাহার আছে!—এমন সময় সত্যবান ঘরে ঢুকিয়া বলিল,

মিছিমিছি আর কষ্ট করছেন কেন? চলুন্ আমার ঘরে, ওখানে চা প্রায় তৈরি।

সাগর ক্ষীণ আপত্তি করিল, না, মিছিমিছি কেন আর—

আচ্ছা থাক্। তা হ'লে আপনার ঘরে এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দেবো?

সাগর লজ্জিত হইয়া বলিল, না—না, কিচ্ছু দর্‌কার নেই। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি।

গোটা দুই পেয়ালা নিয়ে চলুন্। বলিয়া সত্যবান নিজেই দুইটি পেয়ালা তুলিয়া বলিল, সসার্‌গুলো আপনি নিতে পার্‌বেন? কাল রাত্তিরে ডান্ হাতের একটা আঙুল কেটে যাওয়ায় ও হাতটা আপাতত অচল হ'য়ে আছে একেবারে।

সত্যবানের ব্যাণ্ডেইজ্‌-করা আঙুলটির দিকে চাহিয়া সাগরের জিভে আসিতেছিল, আপনি কি এ-সব তৈরি করেন নাকি? না সত্যি-সত্যি হয়! কিন্তু গলা দিয়া কোনো শব্দ উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইল।

সাগরের বোধ হইল, হস্‌টেলু-এর অর্দ্ধেক ছেলেই যেন সত্যবানের ঘরে আসিয়া জুটিয়াছে; অতটুকু ঘর দশ-বারো

জন লোকের মুখের নিঃশ্বাসে ও সিগারেটের ধোঁয়ায় ধূসর হইয়া গেছে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ পাতিয়া প্রচুর পরিমাণে কেইক্-বিস্কুট্ রাখা হইয়াছে, আর টেবিল ও বইয়ের শেল্‌ফের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গাতে প্রচণ্ড গর্জ্জনে স্‌টোভ্ জ্বলিতেছে। সাগরকে দেখিয়া সবাই যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—জানালার পাশে ইজি-চেয়ারটিতে যে বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। আর-একজন জানালার উপর বসিয়া সোৎসাহে পা নাচাইতেছিল, সে পা দুইটাকে স্থির করিয়া ফেলিয়া আকরণেই খানিকটা শিষ্ দিয়া উঠিল। সাগরকে অধুনাশূন্য ইজি-চেয়ারটি দেখাইয়া দিয়া সত্যবান বন্ধুদের ভিড় ঠেলিয়া কোনোমতে তাহার শয্যার এক কোণে একটুখানি জায়গা করিয়া উবু হইয়া শুইয়া পড়িল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, তোর হ'ল কি সতু ?

বালিশটা দিয়া কথাগুলিকে অর্দ্ধেক পিষিয়া মারিয়া সত্যবান বলিল, কিছু না। ন্যাকা, তুই চা তৈরি কর্ না।

সাগর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ইহাদের অন্য-সব কথা ও হাবভাবাদি যেন একটা প্রকাণ্ড ছল; সবাই পরোক্ষে বুঝি তাহাকেই দেখিয়া লইতেছে ও তাহারি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। বালিশের ভিতর হইতে সত্যবান যে শীঘ্র মুখ তুলিবে এমন বোধ হইতেছে না। এই লোকটা যে কী—কাণ্ডজ্ঞান বলিয়া কিছুমাত্র যদি ইহার থাকিত!

সাগর ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু পাছে তাহার ময়ূরপুচ্ছ-আঁকা সিল্কের রুমালখানা অসঙ্গত ভাবে উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

সেই ভয়ে ঘাম মুছিয়া ফেলিতেও পারিল না। স্টোভের শব্দে, সিগারেটের ধোঁয়ায়, এতগুলি প্রাণীর সম্মিলিত নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় সে হাঁপাইয়া উঠিল। এমন কি, বাহিরে যাইতে হইলেও এতগুলি লোককে পাশ কাটাইয়া কিম্বা ডিঙাইয়া যাইতে হয় যে তাহার চাইতে বরং চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই ভালো।

চা তৈয়ারি হইলে পর সত্যবান বালিশ হইতে মুখ তুলিল। সাগরের ভাগে সব চেয়ে বড় পেয়ালাটি পড়িয়াছে কিনা, তাহা নিরূপণ করিয়া বলিল, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ নেই বুঝি, সাগর বাবু? এঁরা সবাই এখানকার বাসিন্দা।

সাগর খামকা লাল হইয়া উঠিয়া বোকার মত শুধু বলিল, ও।

আলাপ হইল। কেহ বলিল, আপনি তো ঘরের মধ্যেই থাকেন দিন-রাত; কেহ বা: আজ্‌কে সকাল থেকেই কি গরম পড়েছে দেখেছেন? অন্য কেউ নমস্কার করিয়া, শুধু বা ঘাড় নাড়িয়াই নির্ব্বাক রহিল।

সাগর জামার হাতা দিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া ফেলিল।

—এই জানিস্ বীরু, রমাপ্রসাদ কি কাণ্ড করেছে?

—ঐ বনলতা-scandal তো! বড্ড পুরানো! নতুন কিছু বা'র কর্ না।

—প্রদোষটা নাকি প্রিলিমিনারিতে ফেল্ করেছে।

—সেদিন অহিভূষণের ক্লাশে—

—কাল বিকেলে মিস্ গাঙ্গুলীর মোটরে—

—আরে রেখে দে, ও আবার ভালো ছাত্র ছিল কবে? ঘষে'-মেজে—

—তা রোজই যায়, ভদ্রলোক কে জানিস্ তো ?

—অহিভূষণ তো একটা idiot ! নইলে কি আর—

—তোর কাছে নতুন razor-blade আছে সতু ?

চারিদিকে কথার স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর তাহারি মাঝখানে নিঃসঙ্গতার দ্বীপে সাগর বসিয়া আছে ! ইহারা সকলে মিলিয়া এক অভিনব শেইক্সপীয়্যর্-গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া যাইতেছে, ও-ভাষার সে সবে মাত্র এ-বি-সি তালিম দিতেছে, দুই একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারে না।

সাগর জানিল, বলিতে গেলে অনেক কথাই বলা যায়। কথা বলিয়াই পৃথিবীতে অনেকে সুখ পায়।

উদর পূর্ত্তি ও ঘরটা নোঙ্রা করিয়া একে-একে সবাই নিজ-নিজ ঘরে চলিয়া গেল। সত্যবান এতক্ষণ একেবারে নীরব হইয়া ছিল, উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে কিনা, তাহাও ঠিক বুঝা যায় নাই। এইবার চোখ তুলিয়া সাগরের দিকে চাহিল। সাগর আর সেই সন্ধ্যার সুবেশ ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইল না। অবিন্যস্ত চুল টের্‌চা ভাবে কপালে আসিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটা কোটরে বসিয়া গেছে, পিঠের কাছ দিয়া গেঞ্জিটা অনেকখানি ছেঁড়া, একান্ত রক্তশূন্যতার জন্য মুখখানা ঠিক কালো না হইয়া পাণ্ডুর হইয়া গেছে। সাগরের দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া নিয়া সে বলিল, শরীরটা ভারি খারাপ হয়েছে, কাল সারারাত ঘুমুই নি।

বাইরে ছিলেন তো ? সাগরের স্বর কেন যে অমন রুক্ষ্ম হইয়া গেল, সে নিজেই তাহা বুঝিল না।

সত্যবানের চোখ দুইটি হাসির ঠেলায় একটু যেন উঠিয়া আসিল।—না,—সে-জন্য নয়। ঘুমুতে পারি নি, এই কাটা-আঙুলটা—

সাগরের হৃদয়টা এতক্ষণ বে-কায়দায় পড়িয়া গিয়া মোচ্‌ড়াইয়া উঠিতেছিল, এই কথা শুনিয়াই সিধা, সজুত হইয়া গেল। রঙীন্ রুমালখানা বাহির করিয়া আঙুলে জড়াইতে-জড়াইতে বলিল, তা হ'লে সারারাত আপনার খুব কষ্ট হয়েছে বলুন্।

বল্‌ছি।

এই লোকটির প্রতি এতদিন সাগর মনে মনেও যে-অবিচার করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সুদ-সমেত পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য এক্ষণে তাহার সমস্ত মন ব্যগ্র, ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আপনার দেখ্‌ছি একটা না একটা কিছু লেগেই আছে—

সত্যবান বলিল, ছেলেবেলায় কখনো মিথ্যে কথা বল্‌তাম না বলে' আমার দিদি আমার নাম রাখেন সত্যবান। সেই পাপেই আমার একটা শাপ লেগেছে যে একটি দিনের জন্যও আমি সুস্থ থাক্‌ব না। যদিও সেই নামেই এখনো পরিচয় দিই—

সাগর মৃদুহাস্যে বলিল, কিন্তু এখন আর সে-পাপ করেন না নিশ্চয়ই—

কিন্তু সত্যবান আর কথা কহিল না। দুইটা বালিশ পাকাইয়া গোল করিয়া বুকের নীচে পাতিয়া পা নাড়িতে-নাড়িতে সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল।

সাগর আবার বলিল, আপনার ঘরটা যে অত্যন্ত নোঙ্‌রা হ'য়ে আছে—

থাক্‌। বলিয়াই সত্যবান আবার গান সুরু করিল।

তারপর সাগর অনেকক্ষণ বসিয়া অনেক কথাই বলিল। সত্যবান মুহূর্ত্তের তরেও গান থামাইল না, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া সাগর বুঝিতে পারিল যে সে সব কথাই শুনিতেছে। অনেকদিন সাগর একসঙ্গে এত কথা বলে নাই।

সত্যবান হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল, যাবেন না?

সাগর চমকিয়া উঠিল।—কোথায়?

ক্লাশ-ট্রাশগুলো এখন থেকেই কামাই করতে আরম্ভ কর্‌বেন? বেশ, করুন্‌।—তারপর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে: যাই আমিও, বালাই সেরে আসি।

সাগর বলিল, আঙুলের যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমুতে পার্‌লেন না, আর কলেজে যাবেন কি করে'?

সত্যবান শুধু হাসিল।

৩

আশৈশব এক সঙ্গীহীন গৃহের বিপুল নির্জ্জনতার মধ্যে লালিত হওয়ায় জনতার প্রতি যে একটি বিমুখতা সাগরের মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সত্যবানের সংস্পর্শে তাহা একটু-একটু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতাও যেন আর অত বিস্বাদ নয়, হস্‌টেল-জীবনের অসংখ্য ছোট-খাটো অসুবিধাও সুসহ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম কয়েকদিন কলিকাতা ইঁট্-সুড়্‌কি ও লোহা-লক্কড়ের একটা প্রকাণ্ড নিষ্প্রাণ পিণ্ড বই আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন সাগর তাহার মধ্যে একটি চির-গতিশীল নিত্যস্পন্দমান প্রাণ আবিষ্কার করিয়াছে ;—এই বিপুল নগরী কোটি কোটি স্নায়ুশিরাতন্ত্রী বিস্তার করিয়া দিয়া আকাশকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে ; সে নড়িয়া-চড়িয়া, কথা কহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া নানাভাবে আপনাকে জাহির করিতে চায় ;—কত রাত্রে হস্‌টেল্-এর তেতলার ছাদে দাঁড়াইয়া অগণন দীপ-ফেনসঙ্কুল কল্লোলিত প্রাণসমুদ্রের দিকে চাহিয়া সাগর আপনার ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা অনুভব করে। সাগর রায় তাহার ছোট হাতখানা উর্দ্ধে বাড়াইয়া দেয়, আকাশকে ধরিতে পারে না। আকাশের তারার ভিড়ের মধ্যে এই পৃথিবীকে তেম্‌নি ক্ষুদ্রাকৃতি একটি আলোকবিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া সুখ পায় ;—কে জানে ঐ ভিড়ের মধ্যে পৃথিবী একদিন পথ হারাইয়া ফেলিবে কিনা।

সাগরের মনের গোপন মহলার জানালাগুলি লোহার হাত বাড়াইয়া কলিকাতা সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—সে গুলি খুলিল বলিয়া। সাগরের বুকের ভিতরটা টনটন্ করিয়া উঠিল,

কোন্ পরমসুখকর আঘাতে কলিকাতা তাহাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে চায়!

সে-বর্ষায় কলিকাতা বড় ম্লান, বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মেজাজ একদিনও ভালো থাকে না, কোনোদিন মুখ-ভার করিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখনো রাগিয়া চুল ছিঁড়িয়া দাঁত কড়্মড়্ করিয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়;—আবার কখনো তাহার সকল উন্মাদনা ও অস্থৈর্য্য একটি শান্ত শীতল বিষাদে পর্য্যবসিত হইয়া নম্র নমস্কারে গলিয়া-গলিয়া পড়ে।

এমনি এক সন্ধ্যায়—কলিকাতা সেদিন বলিতেছে, কেউ আমার কাছে এসো না, আমি রাগ করেছি—সাগর তাহার ঘরে বসিয়া অন্য লোকের অভাবে বাবাকেই একখানা চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময় সত্যবান দরজার কাছ হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল. কি কর্‌ছ, সাগর?

সাগর তাড়াতাড়ি চিঠিটা শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিল, এসো।

তারপর সাগর সত্যবানের মুখে শুনিল যে কে একজন নাকি সাগরের কোন্ কবিতা পড়িয়া মুগ্ধা হইয়া তাহার সহিত পরিচয়ে উন্মুখা হইয়াছে। সত্যবান তাহাকে চেনে, যদি সাগরের কোনো আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সে আজ তাহাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারে।

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তাঁদের চেনো? কেমন লোক তাঁরা?

—সে নিজে দেখেই বিচার করা ভালো।

দুই দিন পূর্ব্বে হইলে সাগর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন আকাশ গুচ্ছ-গুচ্ছ মেঘের ভারে নামিয়া পড়িয়াছে, কলিকাতার মন ভালো নয়। আর্দ্র বাতাসে মনের ভিতরটা যেন ভিজিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর একটুক্ষণ আগেই সাগর বাবার চিঠিখানা পড়িয়া উঠিয়াছে!—সব কথার পর তিনি লিখিয়াছেন, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি তোমাকেই কেবল চিনিয়াছি ও জানিয়াছি, আশা করি তুমি আমাকে কখনো নিরাশ করিবে না। সেই হইতে একটি স্নেহাবনতদেহা, কুসুমকোমলা নারীকে সে প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরে স্মরণ করিতেছে।

সাগরকে চট্ করিয়া রাজি হইয়া যাইতে দেখিয়া সত্যবান আশ্চর্য্য হইল।

লোয়ার সার্কুলার্ রোডের একটি দীপোজ্জ্বল তেতলা বাড়ির ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করা মাত্র সাগরের এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সত্যবান যখন তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, তখন সে কি যে বলিল, নিজেই জানে না। অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া সে যেন আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না, তাহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে, জিহ্বা দিয়া কথাগুলি পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যায়।

নাম শুনিল পত্রলেখা দেবী। সত্যবান আরো যেন কি সব বলিয়াছিল, সেগুলি তাহার কানে ঢোকে নাই।

কিছুক্ষণ পর সে দেখিল সে একটি সোফার এক কোণে

বসিয়া আছে, তাহার মাথার উপর প্রবল বেগে ইলেক্‌ট্রিক্‌ পাখা চলিতেছে, ক্ষণিক বিহ্বলতার মেঘ অপসারিত করিয়া দিয়া স্মৃতির তীক্ষ্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিয়া পড়িতেছে। ঘরের মধ্যখানে একটা টিপায়ের উপর দুই হাতের ভর রাখিয়া সত্যবানকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সব মনে পড়িল।

সাগর মেঝের কার্পেটের লাল ফুলের একটি পাপ্‌ড়ির উপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল, এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কি করিয়া সম্ভব হইল? মায়ের চেহারা কি সে ভুলিয়া গিয়াছে? চোখ বুজিয়া সে মায়ের মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিল;—রঙীন অন্ধকার ভাঙিয়া-ভাঙিয়া একখানা মুখ ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিল;—প্রতিটি কেশের গুচ্ছ সে মনে করিতে পারে, হাসিলে মায়ের মুখে যে কয়টি রেখা ফুটিত, তাহার একটিও তাহার দৃষ্টি-পথ হইতে মুছিয়া যায় নাই। চোখ মেলিয়া সে অদূরে উপবিষ্টা পত্রলেখাকে একবার দেখিয়া লইল, তারপর মনে মনে মিলাইল। আশ্চর্য্য! একেবারে এক!

এক সুমধুর বেদনায় সাগরের সমস্তটা বুক তোলপাড় করিয়া উঠিল। পত্রলেখার দিকে আবার চাহিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে এইখানে, এই মুহূর্ত্তেই তাহার এই অভিনব অনুভূতির অসহ্য আনন্দ কান্নায়-কান্নায় গলিয়া ঝরিয়া পড়ে।

বুকের উপর দুইটি হাত রাখিয়া সে স্থানুর মতো স্থির হইয়া রহিল।

তারপর আর যাহা কিছু ঘটিল—পরিবারের সঙ্গে 'ইনট্রো-ডাক্‌শ্যন্', সাধারণ ভদ্রসম্ভাষণাদির বিনিময়, কুশলজিজ্ঞাসা,

প্রথম পরিচয়ের ধরা-বাঁধা প্রশ্নোত্তরমালা—সব ছায়াবাজির মত ক্ষণ-পরেই হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেল, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। সে কথা কহিয়াছে, কিন্তু নিজে তাহা শুনিতে পায় নাই, হয়-তো হাসিয়াছে পর্য্যন্ত,—কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহার মন বহুদূরে নদীতীরবর্ত্তী এক ছোট শহরে ঘুরিয়া মরিতেছে;—বাহিরে নদীগর্জ্জন আর হাওয়ার হাহাকারের বিরাম নাই, আর বিরাম নাই তাহার কান্নার। দুইটি শীতল চোখ তাহার অঙ্গে স্নেহ ঢালিয়া-ঢালিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সেই চোখ দুইটি সে এই মুহূর্ত্তে একটু মুখ ফিরাইলেই দেখিতে পারে, কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

মা তাহাকে বলিতেছে, আপনার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।

আর-একটু হইলেই সাগর চেঁচাইয়া উঠিত, কিন্তু সম্মুখে পত্রলেখাকে দেখিয়া কোনমতে নিজকে সাম্‌লাইয়া নিতে পারিল মাত্র। একটা অর্থহীন হাসি হাসিয়া, একটু লাল হইয়া উঠিয়া কি-একটা কথা বলি-বলি করিয়াও না বলিয়া, আরো বেশি লাল হইয়া উঠিল।

পত্রলেখা তাহার শাড়ির আঁচল একটু ঘুরাইয়া, কনুই দিয়া সত্যবানকে একটা ঠেলা মারিয়া, একটি হাসিকে আধাআধি ফুটিতে দিয়া কহিল, আপনার বন্ধুটি তো দেখ্‌ছি বড্ড লাজুক;—স্বরটা সে ঠিক সেই পরিমাণে নামাইয়া দিল, যাহাতে শুধু সত্যবানের কাছে একান্তে বলারই মতনই শোনায়, কিন্তু সাগরও কথাটা শুনিতে পায়।

প্রত্যুত্তরে সত্যবান, একবার পত্রলেখার একবার সাগরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাগর মনে-মনে বুঝিল, এখন একটা কিছু বলিলে তবু মুখ-রক্ষা হয়, কিন্তু যত বাঙ্‌লা কিম্বা ইংরাজি শব্দ তাহার মনে আসিল, তাহার একটিও এ-ক্ষেত্রে বলার উপযুক্ত বলিয়া তাহার বোধ হইল না।

পত্রলেখা ভাসিতে-ভাসিতে মিসেস্ চ্যাটার্জি, তাহার মায়ের কাছে গিয়া ঠেকিল। বেশ উচ্চৈঃস্বরেই কহিল, তোমাকে সেদিন এঁরই একটা লেখা দেখাচ্ছিলাম, বেশ dainty verse। পরে সাগরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঃ

কিন্তু আপনার বয়েস তো খুবই কম!

সত্যবান চোখের একটি চাহনির মারফৎ সাগরকে অনেকখানি উৎসাহ পাঠাইয়া দিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সাগর বলিতে পারিল, হ্যাঁ।

সাগর এখন উঠিতে পারিলে বাঁচে। এই পরিপাটি ঘরের পরিমিত নিশ্বাস-বায়ু তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যে-কণ্ঠস্বরের অপরূপ, ঘুম-পাড়ানিয়া মাদকতা তাহার জীবনের প্রথম শোকে প্রথম সান্ত্বনা আনিয়াছে, সেই স্বর তাহাকে কানেও শুনিতে হইবে, অথচ নিতান্ত ভদ্রলোকের মত সোফায় বসিয়া মৃদু আলাপ-গুঞ্জন করিতে হইবে, এমন তো কোনো কথা ছিল না। একটু চেষ্টার ফলে সত্যবানের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল।

সত্যবান বুঝিয়া নিল। তবু, ভদ্রতানুসারে খানিকটা সময় বাদ দিয়াই যাইবার কথা পাড়িল।

পত্রলেখা তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সাগরকে শুনাইয়া-শুনাইয়া সত্যবানকে ক'হল, তুমি বড্ড বাড় বেড়েছ কিন্তু। মাসে একদিন দেখা নেই! জানো তো, মেয়েরা একবার jealous হ'লে—

বাকি কথাটুকু কিন্তু সাগর শুনিতে পাইল না। পরে সাগরের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ঘাড় দোলাইয়া, সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া খোঁপার একটা শিথিল কাঁটা আঁটিয়া দিতে-দিতে বলিল, মাঝে-মাঝে আস্‌বেন। ··· নমস্কার।

কথা কহিবার সময় ক্ষীণ হাসিতে চোখের নীচেকার চামড়া যে একটু ঝুলিয়া পড়ে, ঐ হাসির শেষ রেখাটি গলার কাছে যে একটি টোল ফুটায়, তাহাও একেবারে একই রকম।

সাগর ততক্ষণ সহজভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতে পারিল না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কলিকাতা তাহাকে আবার আপনার কোলে ফিরাইয়া না লইল। ও-বাড়িতে সে যতক্ষণ বসিয়া ছিল, ততক্ষণ নিজের অস্তিত্বের চেতনা তাহার শিথিল মনকে বিশেষ পীড়া দিতেছিল, একটি নিমেষের তরেও আত্ম-বিস্মৃত হইতে সে পারে নাই। কিন্তু এক বিপুলগতি বাস্‌-এ চৌরঙ্গীর উপর দিয়া উড়িতে-উড়িতে তাহার মন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কলিকাতার বাতাস তাহার চুলে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে বলিয়া গেল, তুমি কেউ নও, তুমি নেই;—জোয়ারের ঢেউয়ের মধ্যে এক ফোঁটা জল—তা-ও, তা-ও তুমি নও।

সাড়া.

ট্রামের তারে-তারে, মোটরের চাকায়-চাকায়, মানুষের কণ্ঠে-কণ্ঠে কলিকাতা আকাশ-বিদারণ অট্টহাস্য করিয়া ফিরিতেছে। এক বর্ব্বর যুবতী এইমাত্র নিজের যৌবন সম্বন্ধে সচেতন হইল; তাহার শিরায়-শিরায় উচ্ছলিত পশুশক্তির আদিম উল্লাসে সে আকাশকে কুচি-কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়।

এতক্ষণে সাগর বলিতে পারিল, ও-মেয়েটির মুখখানা হুবহু আমার মায়ের মতো।

সত্যবান একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লুণ্ঠিত কোঁচাটা ঝাড়িয়া লইয়া ভালো হইয়া বসিল।

সাগর আবার জিজ্ঞাসা করিল, ওকে তুমি কতদিন ধরে' চেনো?

—বছর দুই।

সাগর বলিল, মেয়েটি তোমাকে খুবই—খুবই পছন্দ করে মনে হ'ল।

হুঁ। সত্যবান একটা সিগারেট্ জ্বালাইল।

তাহার মায়ের মুখের প্রতিটি রেখা মুখে আঁকিয়া যে-মেয়েটি এই পৃথিবীতেই চলাফিরা করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আরো—আরো তথ্য জানিবার জন্য সাগরের মন আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল। হয়-তো কিছুই মিল্ ছিল না, কিম্বা সামান্য একটু ছিল, কিন্তু সাগরের পিপাসিত হৃদয়ে তাহারি কোনো কূলকিনারা মিলিতেছে না। পত্রলেখা কি করিয়া, কেমন করিয়া দিন কাটায়, কবে সে কোন্ গান গাহিয়াছিল, কবে নীল রঙের শাড়ি পরিয়াছিল আর কবে বেগুনি—তুচ্ছতম সকল খুঁটিনাটি

সত্যবানকে দিয়া সে বলাইয়া ছাড়িল। সাগরের মনে হইল, সত্যবান নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে কথা কহিতেছে, প্রশ্নের উত্তরে যেটুকু না বলিলেই নয়, সেটুকু বলিয়াই সে নীরব রহিতেছে। সাগরের অভিমান ব্যথিত হইল। সত্যবান অন্তরঙ্গরূপে পত্রলেখাকে চেনে—দুই বছর ধরিয়া চিনিয়া আসিতেছে—কেন সত্যবান কথার বন্যায় তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে না, যত কথা বলা যায় এবং যায় না, সব ঢালিয়া-ঢালিয়া তাহার শূন্যতা ভরিয়া তুলিতেছে না কেন?

বলিল, সত্যবান্, আজ্‌কে আমি কী বোকামিটাই কর্‌লাম।

সত্যবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দড়ি টানিয়া বলিল, এসো, নাব্‌তে হ'বে এখন।

৪

প্রতি রাত্রেই যে সত্যবান ঘরের বাহির হইয়া যাইত, এমন নয়। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা হইতেই তাহার ঘরে মজ্‌লিশ্‌ বসিত, ভাত খাইবার জন্য উঠিয়া যাইবার অবসরটুকুই পর্য্যন্ত কাহারও জুটিত না। তাই বলিয়া অবশ্য কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হইত না।

সত্যবান যেন একটা নিবিয়া-যাওয়া সূর্য্য, তাহার আলো নাই, তাপ নাই, কিন্তু আকর্ষণী-শক্তি আছে। সে নিজে এক কোণে নিঃশব্দ, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই চারিদিক হইতে সব ছুটিয়া আসিয়া জড়ো হয়। সে কাছে থাকিলে কোনো কথা বলিতে মুখে আট্‌কায় না, কোনো আচরণ অন্যায়, অসঙ্গত মনে হয় না।

অতটুকু ঘরে ঠাসাঠাসি করিয়া দশ-বারো জনে নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বসিয়া পিঠে ব্যথা করিয়া ছাড়ে;—ন্যাকা চা তৈয়ারি করে, রুটিতে মাখন মাখায়, মোটা ভোম্বল পাণ চিবাইতে-চিবাইতে রসিকতা করে, মিহির ফরাসী উচ্চারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়; তাহার মাস্‌তুতো মামা বিলাতে গিয়া এক ফরাসিনীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, এই অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সকল তর্ক ভাসাইয়া দেয়। চার-পাঁচজনে গোল হইয়া বসিয়া রসালো নিন্দা করে, কেহ বা হাঁটু দুইটা বুকের সঙ্গে ঠেকাইয়া উহারি মধ্যে তোফা নাক ডাকাইয়া ঘুম দেয়।

মোটের উপর সোরগোলটি বেশ জমিয়া উঠে। সত্যবান দেয়াল ঘেঁষিয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া কপালের উপর একখানা বাহু স্থাপন করিয়া পড়িয়া থাকে, চায়ের পেয়ালা কাছে আনিয়া

ধরিলে মুখ খুলিয়া দয়া করিয়া খায়, আর মাঝে মাঝে সিগারেট্ ফোঁকে। দুই-তিন ঘণ্টায় সে দুই-তিনটি কথা বলে কিনা সন্দেহ।

ইজি-চেয়ারটির উপর আজকাল সাগরের একচ্ছত্র আধিপত্য। সকল কথাতেই তাহার যোগ দেওয়া চাই, যে-কোনো বিষয়ে সাগরের মতামতের মূল্য আছে, কথা কহিয়া ক্লান্ত হইতে সে পারিবে না।

মাঝে-মাঝে একটা কথার মধ্যখানে থামিয়া গিয়া সে সত্যবানের দিকে তাকায়, কিন্তু তাহার চোখ দেখিতে পায় না। সাগর তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এ কথা সত্যবান কেমন করিয়া যেন টের পায়। চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি সাগর?

সাগর তখন-তখন ভাবিয়া বলে, চলো সাড়ে ন'টার শো-তে বায়োস্কোপ দেখে আসি।

সত্যবানের মাথা ধরিয়াছে। সে যাইতে পারিবে না।

সাগর খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, আমি তা' আগেই জান্‌তাম।

অন্য সবাই সে-হাসিতে যোগ দেয়।

সত্যবানের মাথা ধরিয়াছে, এ-কথাটা যেন উড়াইয়া দিবার মত। হাসাহাসি, তর্ক-বিতর্ক পুরামাত্রাতেই চলিতে থাকে। একবার চায়ের পালা শেষ হইলেই আবার স্টোভ্ জ্বলে; ঐ ছোট্ট ঘরে বসিয়া স্টোভের শব্দ শুনিতে-শুনিতে সাগরের মনে হয়, তাহারা সবাই যেন এক স্টিমারে চড়িয়া খামকা বাহির

হইয়া পড়িয়াছে,—বিশেষ কোথাও যে যাইবে, তা' নয়, এম্‌নিই। চায়ের সঙ্গে শক্ত পাঁউরুটি ও নিজের ও পরস্পরের মস্তিষ্ক চিবাইয়া-চিবাইয়া খাওয়া হয়।

সত্যবান এক সময় বলিয়া ফেলে, তোরা এত যে গোলমাল করিস্, দেবে যখন একদিন হস্‌টেল্ থেকে তাড়িয়ে, সেদিন টেরটা পাবি।

অশোক এক গাল হাসিয়া বলে, তা হ'লে তোমাকে কি আর রেয়াৎ কর্‌বে বাবা ?

—আমি তো নিজের সম্বন্ধে সকল আশা-ভরসা ছেড়েই দিয়েছি! তোরা যখন কাঁধে এসে জুটেছিস্!

বিনোদ কোনো অখ্যাত কবিতা হইতে একটি লাইন্ আবৃত্তি করে, কাঁধের শনি নয় ও তো মোর, ও যে আমার চোখের মণি!

সকলেই খুব তারিফ্ করিয়া বাহবা দিয়া উঠে। সত্যবানের যাহা-কিছু বলিবার থাকে, সব চাপা পড়িয়া যায়।

মোটা ভোম্বল এক সময় তাহার হেঁড়ে গলাটিকে শাণ দিয়া বলিয়া উঠে, আচ্ছা, এইবার তা হ'লে ঘুমুতে যাওয়া যাক্। অনেক সদালাপ হ'ল—

অশোক তাহাকে ধম্‌কাইয়া দেয়—এখুনি যাবি কি রে? দু'টো খারাপ কথা হ'ল না—রাত্তিরে ঘুম হ'বে কেন ?

ভোম্বলের ততক্ষণে হাই উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, তোমরা যত ইচ্ছে মুখ-খারাপ করো বাপু, আমি চল্‌লাম ঘুমুতে।

মিহির উপদেশ দেয়, এইবার ঘরটা গুছিয়ে নে সতু, আলো তো নিব্‌ল বলে'।

সবাই জানিত, এগারোটা বাজিবার কাছাকাছি আসিলেই ভোম্বলকে আর জাগাইয়া রাখা অসম্ভব, এবং এগারোটাও বাজিল কি ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোও নিবিল।

সত্যবান এইবার চোট্‌পাট্‌ করিয়া উঠে, এই, তোরা ওঠ্‌ সব—যা'র যা'র ঘরে গিয়ে শু'লেই হয়। না সবাই গুজ্‌গুজ্‌ কর্‌তে-কর্‌তে আস্‌বেন এখানে! কেন বাপু? আমি কি বিনি-পয়সার হোটেল্‌ খুলেছি একটা? এই 'পচা, ওঠ্‌! বলিয়া পায়ের নীচে শায়িত কুণ্ডলী-পাকানো ছেলেটিকে লাথি মারিয়াই জাগাইয়া তোলে বুঝি!

কিন্তু উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে যেটুকু দেরি হইয়া যায়, তাহার মধ্যে আলো নিবিয়া গেছে। অন্ধকারে হুড়াহুড়ি করিয়া সবাই গমনোদ্যত হয়, কেহ জুতা খুঁজিয়া পায় না, কেহ বা নিজের এক পাটি, অন্যের এক পাটি পরিয়াই, কেহ বা খালি পায়ে বাহির হইয়া যায়।

বিনোদ কোনো অখ্যাত কবির এক লাইন আওড়ায়, অন্ধকারে হারিয়ে গেছে আমার চটির পাটি।

একজন দু'জন করিয়া সকলেই চলিয়া যায়। সাগর তখন বলে, এইবার আমিও উঠি।

সত্যবান নির্দ্দয় ভাবে বিমর্দ্দিত বিছানা ভরিয়া দেশ্‌লাইয়ের জন্য হাতাইতে-হাতাইতে বলে, বোসো না একটু।

—আচ্ছা দাও, আর-একটা সিগারেট্‌ খেয়ে যাই।

সত্যবান মাজায় কাপড় বাঁধিতে-বাঁধিতে উঠিয়া মোমবাতি খুঁজিতে থাকে। সাগর বলে, আলো জ্বেলে আর লাভ কি? এম্‌নিই তো বেশ।

প্রচুর আলোক ও অট্টরোলের পর অন্ধকারটিকে বেশ শীতল ও সস্নেহ মনে হয়। কোনো-কোনো রাতে চাই কি পূবের জানালা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্নাই আসিয়া পড়িল!

অন্ধকারে দুইটা সিগারেটের মুখ দুইটা রক্তচক্ষুর মত জ্বলিতে থাকে।

সিগারেট্ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, কিন্তু তবু সাগর উঠে না, বরং ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া আরো আরাম করিয়া বসিয়া নেয়।

সত্যবান বলে, উঃ, মাথাটা ছিঁড়ে' পড়্‌ছে একেবারে।

সাগর কোমল সুরে বলে, কেন তুমি ওদের এত হৈ-চৈ কর্‌তে দাও? ওতে তো আরো বাড়ে!

সত্যবান কোনো উত্তর না দিয়া ঘুমাইবার মত করিয়া শুইয়া পড়ে; তবু সাগর বহুক্ষণ বসিয়া থাকে, মনে মনে সত্যবানের মাথাটি একটু টিপিয়া দেয়, কপালে হাত রাখিয়া মাথার ভিতরের উগ্র স্পন্দন অনুভব করিতে থাকে। সমস্ত মাথাটা এখনই যেন ফাটিয়া পড়িবে!

৫

পত্রলেখার সঙ্গে আবার দেখা হইবার পূর্ব্বে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল।

এই সময়টা সাগর যে বিশেষ ভাবে পত্রলেখার ধ্যান করিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু ঐ একদিনের একটু পরিচয়ের পর তাহার মনটা যেন সিজিল্-মিছিল্ হইয়া নিজকে গুছাইয়া লইতে পারিয়াছে, তাহার নবীন যৌবনের লতা জড়াইয়া ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবার মত একটি সহকারশাখার আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার মনের সকল সংক্ষোভ ও বিপর্য্যয় নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। জীবন এখন তাহার পক্ষে সহজ, স্বচ্ছন্দ হইয়া গেছে—যখনই কোনো সাময়িক অতৃপ্তিতে বুক টন্‌টন্ করিয়া উঠে, তখনি তাহারই মায়ের মুখের মতো একখানি নম্র, স্নেহাবনত মুখ স্মরণ করিলে তৃপ্তির জোয়ারে হৃদয় কানায়-কানায় দুলিয়া উঠে।

কেন যে সত্যবান পত্রলেখার সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিল, তাহা সত্যবানকে জিজ্ঞাসা করিবার লোভ সাগরের প্রায়ই হইয়াছে। সত্যবান ও পত্রলেখার মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের একটি পরমরহস্যময় সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, এই কথা বিশ্বাস করিয়া সাগর মনে-মনে চাঞ্চল্য অনুভব করিত; সত্যবান যেন কি রকম, কোনো কথা কহিবার আগ্রহ তাহার নাই, ক্ষুদ্রতম কাজটুকু করিতেও সে যেন অপারগ। অথচ পত্রলেখা তাহার যৌবনের সকল সুষমাকে গোপনে সত্যবানের জন্যই হয়-তো সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু সত্যবানের সেদিকে খেয়াল নাই। এই দুই জনের মাঝখানে সাগর দূরতম ভবিষ্যতেও

একটা অন্তরায় হইতে পারে ভাবিয়া তাহার সমস্ত মন সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যাইত।

একদিন কি একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে মিসেস্ চ্যাটার্জি তাহাদের দুইজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সাগর ঘোষণা করিল যে সে যাইবে না।

সত্যবানের চোখ দুইটি হাসিতে ঝিল্‌মিল্ করিয়া উঠিল,—কেন ?

সাগর চট্ করিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিল না। পরে ভাবিল, যা থাকে কপালে, একটা বোঝাপড়া হইয়া যাউক। গম্ভীর হইয়া বলিল, আমায় সত্যি করে' একটা কথা বল্‌বে সত্যবান ?

সত্যবান বালিশে ঠেস্ দিয়া বসিয়া, একটা হাই তুলিতে-তুলিতে বলিল, জানো তো, সত্যি কথাই বল্‌তে হ'বে কেবল, এ-দুর্ব্বলতা বহুদিন কাটিয়ে উঠেছি।

তথাপি সাগর বলিয়া বসিল, তুমি কি সত্যি চাও যে আমি ওখানে যাই ?

মুহূর্ত্তের তরে সত্যবানের ম্লান মুখ ম্লানতর হইয়া গেল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কিছুই চাই নে সাগর। ফলে এই হয় যে যা-কিছু পাওয়া যায়, তা একান্ত আশাতীত বলে'ই খুব বড় মনে হয়।

সাগর তবু হাল ছাড়িল না।—আমার প্রশ্নের তো কই উত্তর দিলে না!

সত্যবান খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, আমার ইচ্ছে

বা অনিচ্ছে অনুসারে অন্য কেউ চল্‌বে, নিজের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা আমি পোষণ করিনে। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে আমার মতামতের কথা ওঠেই না। তারপর একটু থামিয়া, দুই হাতে একটা বালিশকে ডলিতে-ডলিতে :

তবে এটুকু তোমাকে বল্‌তে পারি যে গেলে তুমি খুসিই হ'বে।

সাগর নিজেই অনুভব করিল যে সে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল, কিন্তু আমার কি মনে হয়েছে জানো সত্যবান ?

একটি ম্লান হাসি সত্যবানের চোখ হইতে নামিয়া ধীরে-ধীরে ঠোঁট পর্য্যন্ত আসিয়া মিলাইয়া গেল। বলিল, অমন অনেক-কিছুই মনে হ'বে তোমার। আজ্‌কের ব্যাপারটা দেখেই এসো একবার।

সাগরের মন তবু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। চলো—এই কথা আন্তরিক উৎসাহসহকারে তো সত্যবান একটিবারও বলিল না।

একবার ভাবিল, যাইবে না, কিন্তু তখনই পত্রলেখার ললাটের উপর আসিয়া লুটাইয়া-পড়া দুই-একটি অলকগুচ্ছ তাহার মনে পড়িল, আর বর্ষা-সমাগমে বিরহ-ভীরু কপোতের মত তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল।

সে-সন্ধ্যায় অত্যুজ্জ্বল আলোর নীচে সুসজ্জিতা, সুন্দরী পত্রলেখাকে ঘিরিয়া চারিদিক হইতে মৃদু স্তবগুঞ্জন উঠিতেছে;

এক করুণাময়ী দেবীর মত সে ভক্তবৃন্দকে প্রসাদবিতরণ করিতেছে—কাহাকেও একটু বাঁকা হাসি, কাহাকেও বা দুইটি ছোট কথা। পত্রলেখার উগ্র লাল রঙ্-য়ের শাড়িটা সাগরের চোখে যেন ঠাস্ করিয়া একটা বাড়ি মারিল;—কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে চোখ মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিতে পারিল না। পত্রলেখা তাহাকে বলিতেছে, বাবা, কী লোক আপনি, নেমন্তন্ন করে' না পাঠালে কি আস্তে নেই! কথাগুলি হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া একটি কোমল আদরের মত তাহার কানকে স্পর্শ করিল, সঙ্গে-সঙ্গে একটি মৃদুতম সুগন্ধে তাহার নিঃশ্বাস বাউল হইয়া ফিরিতে লাগিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে বলিয়া ফেলিল, সাহস হয় নি।

পত্রলেখা হাসিল। তাহার পাণ্ডুর দুটি গালে ক্ষণ-তরে দুইটি গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। এই হাসি সাগরের অপরিচিত নয়। বহু নিদ্রাতুর সন্ধ্যায় মাতৃদেহের সঙ্গে বিলীন হইয়া সে মায়ের মুখে এই হাসিটির বিকাশ কৌতূহলী নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছে;—আরব্যোপন্যাসের রাজকুমারীদের মুখে ঐ হাসিই সে দেখিয়াছে, বাতায়নবর্ত্তিনী জুলিয়েটের অধরেও ঐ ম্লান, ক্ষীণ হাসিই স্ফুরিত হইতেছে। আজ কিন্তু সাগরের আর তাহার মা-কে মনে পড়িল না, ঐ হাসিকে সে নিজের মনে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহাকে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা দিল;—বহির্জ্জগতে তাহার নিজস্ব কোনো অস্তিত্বই নাই, সেখানে তাহা লক্ষ-লক্ষ হাসির সঙ্গে মিশিয়া আছে, কিন্তু তাহার মানস-লোকের অপরিসীম শূন্যতাকে বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত করিয়া সেই হাসিটি পূর্ণিমার মতো বিরাজ করিতেছে।

পত্রলেখা বলিল, বসুন্ না।

সাগর একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সত্যবান অনাহূত ভাবেই অর্গ্যানের পাশের টুল্‌টায় বসিয়া অর্গ্যানের ঢাক্‌নাটা খুলিল।

অভ্যাগতদের ভিতর হইতে একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, দয়া করে' একটু বাজান্ না, সত্যবানবাবু।

সাগর চাহিয়া দেখিল, সে ভুল বুঝিয়াছিল। যে কথা বলিতেছে সে মেয়ে নয়, তবে হইলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। ভদ্রলোকটির মুখখানা দিব্যি গৌরবর্ণ, বড়-বড় চুল ঘাড়ের কাছ দিয়া কোঁকড়ানো, গায়ে নীল খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরণে সবুজ নাগ্‌রা, চোখে একটা প্যাঁস্‌নে-ও আছে। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লীলায়িত করিয়া দিয়া নিতান্ত অলসভাবে একটি সোফায় গা এলাইয়া দিয়াছে।

পত্রলেখা তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া বলিল, আপনাদের আলাপ নেই বুঝি? ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ, প্রসিদ্ধ আর্টিস্‌ট্, আর—

সাগরের পরিচয় শুনিয়া আর্টিস্‌ট্-গণেশের নাকের ডগাটি ঈষৎ উপর দিকে উঠিয়া গেল ও কপালের চাম্‌ড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। গলা দিয়া ছুঁচের মতো চোখা অদ্ভুত এক প্রকার আওয়াজ বাহির করিয়া বলিল, ওঃ, কবিতা লেখেন!

—আর ইনি শ্রীমুকুলেশ সেনগুপ্ত—

মুকুলেশ নাম শুনিয়া সাগর একটু চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই! তাহাদের ইংরেজির জুনিয়র্ প্রফেসর্ মুকুলেশ বাবু তাঁহার ঈষৎ স্থূল বপুকে কোনো

প্রকারে চেয়ারের মধ্যে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া বসিয়া আছেন। ইলেক্‌ট্রিক্ আলোতে তাঁহার টাকটি রীতিমত চক্‌চক্ করিতেছে। সাগর একটু ভড়্‌কাইয়া গেল। মুকুলেশ মুখব্যাদান করিয়া বলিল, বিলক্ষণ! এঁকে চিনি নে! আমার ছাত্র যে!

পত্রলেখা কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, সত্যি?

মুকুলেশ তাহার গলাটিকে চাঁছিয়া-ছুলিয়া একেবারে বল্লমের মুখের মতো ধারালো করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপর সে আবার একটু নাকীস্বরে কথা কয়। তাই তাহার প্রতিটি কথা যেন এক-একটি আলপিনের মতো গায়ে আসিয়া বিঁধে। পান খাইয়া-খাইয়া সে সাম্‌নের গোটা কতক দাঁত একেবারে কালো করিয়া ফেলিয়াছে, হাসিলে সেগুলি বাহির হইয়া পড়ে। গোঁফে হাত বুলাইতে-বুলাইতে মুকুলেশ কহিল, আপনারা তো কেউ বিশ্বাস কর্‌বেন না মিস্ চ্যাটার্জি,—আচ্ছা, এঁকেই জিজ্ঞেস্ করুন্ আমি কেমন পড়াই! সেদিন অনার্স্ ক্লাশে—

প্রত্যেকটি কথা মুখের মধ্যে চিবাইয়া-চিবাইয়া অর্দ্ধেকটা কোনোমতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বাকি অর্দ্ধেকটা গিলিয়া ফেলিতেছে। কথাগুলি পূরাপূরি খরচ করিয়া ফেলিতে যেন মুকুলেশের প্রাণে সয় না। সাগরের ভয়ানক হাসি পাইল, কিন্তু তবু সে মুকুলেশের অধ্যাপনার খুব তারিফ করিল।

মুকুলেশ তাহার শুক্‌নো খট্‌খটে হাসি হাসিল—হ্যাহ্, হ্যাহ্, হ্যাহ্।

পত্রলেখা সরিয়া আসিয়া সাগরের কানের কাছে মুখ নামাইয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, Feeling bored?

বোধ হয় পত্রলেখার অসাবধানতাবশতই—তাহার এক গোছা চুল ফ্যানের হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুভাবে সাগরের কপোল স্পর্শ করিল। সাগর আপাদমস্তক একবার শিহরিত হইয়া উঠিয়া তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে বলিল, না মোটেও না।

পত্রলেখা বলিল, ও, আমাদের কন্দর্পটির সঙ্গেই বুঝি আপনার এতক্ষণ আলাপ হয় নি, সাগরবাবু—

সাগর দেখিল, একটু দূরে এক ভদ্রলোক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি রোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। খানিকটা আওয়াজ তাহার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গলা দিয়া বাহির হইয়া আঙুল দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

সাগরকে নমস্কার করিবার জন্য কন্দর্পকে যখন মুখের উপর হইতে হাত সরাইয়া নিতে হইল, তখনও সাগর তাহার দুই চক্‌চকে চোখে হাসির চঞ্চল ছটা দেখিতে পাইল।

গণেশ অতি কষ্টে ঠোঁট দু'টিকে একটু বাঁকাইয়া হাসির মতো চেহারা করিয়া বলিল, ও কি হ'ল আপনার কন্দর্পবাবু? অত হাস্‌ছেন কেন?

কন্দর্প বলিল, কী অদ্ভুত। হাস্‌লাম কখন্?

পত্রলেখা কহিল, বেশ কন্দর্পবাবু, আপনি বেশ ভুল্‌তে পারেন দেখ্‌ছি। এই যে এইমাত্র—

ও, তখন? তখন হাস্‌ছিলাম একটা কারণে—

কি মুস্কিল। সেই কারণটাই তো জান্‌তে চাইছি।

ও কিছু নয়।

পত্রলেখা জেদ্ ধরিয়া বসিল, না, আপনাকে বল্‌তেই হ'বে। কেন হাস্‌ছিলেন তখন ?

কন্দর্প অগত্যা বলিল, হাস্‌ছিলাম এই দেখে যে মুকুলেশ-বাবু অনেকক্ষণ ধরে' একটা-কিছু বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পেয়ে উঠ্‌ছিলেন না।

হাস্‌তে হ'বে বলে'ই আপনার এ-সব চোখে পড়ে। এ-চোখে দেখ্‌লে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে কেবল হাসা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না !

কী অদ্ভুত ! আমি বুঝি তাই—

কিন্তু আর বলিতে হইল না। আর-একটা দম্‌কা হাসির হাওয়ায় কথাগুলি ভাসিয়া গেল।

গণেশ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের ধরনে হাতের মুঠি একবার খুলিয়া একবার বন্ধ করিয়া বলিল, কিন্তু কই সত্যবান বাবু, আপনার গান তো শুন্‌লাম না—

অর্গ্যানের ঠাণ্ডা চাবিগুলির উপর মাথা রাখিয়া সত্যবান এতক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া ছিল, হয়-তো বা ঘুমাইতেই ছিল ;—হঠাৎ মাথা তুলিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে বলিল, পাগল হয়েছেন ? আমি গান গাইলে ভূত পালাবে। বরঞ্চ তুমি এসো পত্রলেখা—

পত্রলেখাকে অত অন্তরঙ্গ ভাবে সম্বোধন করিতে দেখিয়া সত্যবানের প্রতি কেহই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে না তাকাইয়া পারিল না। গণেশ ঠোঁটটা একটু বাঁকাইয়া, প্যাঁস্‌নেটা খুলিয়া আবার পরিয়া নিল, মুকুলেশ পাথরের মতো নিরেট্ দৃষ্টি দিয়া

সত্যবানকে বিঁধিতে লাগিল, আর কন্দর্প চট্ করিয়া একবার চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

পত্রলেখা ও সাগরের মাঝখানে যে ব্যবধানের বিস্তৃত সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, সত্যবানের এই ঘনিষ্ঠতাটুকু যেন তাহার উপর একটি সেতুবন্ধন গড়িয়া তুলিল—সাগর এখন ইচ্ছা করিলেই পত্রলেখার যৌবনের উপকূলে গিয়া আছাড়িয়া পড়িতে পারে।

মুকুলেশ বলিল, 'I pant for the music which is divine'—

গণেশ বলিল, 'গান এসেছে সুর আসে নি'—আপনার কি সেই অবস্থা হয়েছে ?

কন্দর্প বলিল, সবাই এত করে' বল্‌ছে যখন, টুক্ করে' গেয়ে ফেলুন্ না একটা।

কন্দর্পের গলার স্বরে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যে-জন্য সাগর তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া পারিল না। কালো মুখের উপর কালো চোখ দুইটি হাসিতে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে ;—পৃথিবীতে আসিয়া অবধি সে যেন শুধু হাস্যাস্পদ দৃশ্যই দেখিয়া আসিতেছে, এমন কিছু ইহলোকে নাই, যাহা দেখিয়া তাহার হাসির উদ্রেক না হয়। এখানেও সে শুধু মজা দেখিতেই আসিয়াছে ;—সে নিজে নির্লিপ্ত, একেবারে উদাসীন, হাসিতে হইবে বলিয়া একটা টিকিট্ কিনিয়া এই প্রহসন দেখিবার জন্য দর্শকদের চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছে মাত্র।

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, হাস্‌ছেন যে ?

কন্দর্প বলিল, আপনি এ সুযোগ ছাড়্‌লেন কেন ? আপনার

কি কোনো কবিতা মুখস্ত নেই? গণেশ বাবু এখনো বোধ হয় নতুন কোনো লাইন্ খুঁজে' বেড়াচ্ছেন—কিন্তু যাক্ গে, গান শুনুন্।

গানের পর যথারীতি প্রশংসা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গণেশ যথারীতি আর-একটি গানের জন্য কাতর অনুনয় করিল, এবং পত্রলেখা যথারীতি রাজি হইল না। সে ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ কী বিশ্রী গরম পড়িয়াছে—'Oh my poor nerves!'…

সভাভঙ্গের সময় পত্রলেখা বারান্দা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল। তারপর সাগর ও সত্যবানের সঙ্গে-সঙ্গে ছোট বাগানটি পার হইয়া রাস্তার পাশের গেইট্ পর্য্যন্ত আসিল। তারপর ছোট ফটকটির উপর আপনার দেহের ভর্ রাখিয়া অর্দ্ধাবনত হইয়া সাগরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনির্ব্বচনীয় হাসিতে মুখখানা মধুর করিয়া সুধাকণ্ঠে বলিল, কাল আবার আস্ছেন তো?

পত্রলেখার কয়েকটা উষ্ণ নিঃশ্বাস সাগরের মুখখানাকে ধুইয়া দিয়া গেল। মৃদু সুগন্ধে আচ্ছন্ন, অভিভূত সে—একটি কথাও বলিতে পারিল না। রসসঞ্চয়নিপীড়িত দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতো তাহার মন নিজকে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না—এখনি অসহ্য আনন্দে ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার মনের মধ্যে অপরূপ কবিতা জন্ম নিতেছে, দারুণ যন্ত্রণায় তাহার উন্মাদ হৃদ্‌পিণ্ডটা মোচড় দিয়া উঠিতেছে। যে-কথা কেহ কোনোদিন শোনে নাই, পৃথিবীকে সে সেই কথা শুনাইবে, অনবদ্য বাণী গাঁথিয়া-গাঁথিয়া সে এমন একটি স্বপ্ন-

সৌধ গড়িয়া তুলিবে, যাহার নীচে মানুষ চির-কালের মত শ্রদ্ধায় ও আনন্দে আপনাকে অবনত করিবে, যাহার চূড়া বিধাতার সিংহাসন-তল চুম্বন করিয়াছে !

সিংহশিশু এইমাত্র আপনার শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হইল, আপন শক্তির প্রাচুর্য্যে সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ফিরিতেছে।

একটি কথা কহিবার, একটু হাত পা নাড়িবার বা ক্ষণ-তরেও অন্য কোনো কথা ভাবিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে এ-নেশা কাটিয়া যায় ! পকেট্‌ হইতে চাবি বাহির করিয়া ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বালানো, কাগজ-কলম বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলি সে এমন ভাবে সম্পন্ন করিল, যেন সে কোনো দেবমন্দিরের নৈবেদ্য সাজাইতেছে। তাহার বুকের মধ্যে কথাগুলি বাহিরে আসিবার প্রবল আগ্রহে কলরব করিতেছে, সে বহু-চেষ্টায় তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, এখন একটু প্রশ্রয় দেওয়া কি তাহারা হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে !

ঘড়িটা দুইটা বাজিবার বারো মিনিট্‌ বাকি থাকিতে বন্ধ হইয়া গেছে, টেবিলের উপর মোমবাতিটা এতক্ষণে শেষ হইয়া আসিল। সাগর যন্ত্রচালিতের মতো আর-একটা মোমবাতি জ্বালাইল। কলিকাতা এই ফাঁকে একটু ঘুমাইয়া নিতেছে—বর্ব্বর যুবতী কলিকাতারও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সারাটা দিন দুর্দ্দান্তপণা করিয়া এখন সে অবসন্ন—আবার সূর্য্যের আগেই জাগিয়া উঠিয়া বসিবে,, তাহার গা-মোড়ামুড়ি দেওয়ার শব্দে মানুষের মন ভাঙিয়া যাইবে। একটি সলজ্জ তারা

সাড়া

মেঘাবগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া একবার মুখ বাহির করিয়াই আবার মিলাইয়া গেল, একটুখানি হাওয়া থাকিয়া-থাকিয়া সাগরের চুলগুলি লইয়া আদর করিতেছে ;—আর তাহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া ছোট সাগর, ছোট মানুষ সাগর, ক্ষণিকের রসাবেশে বিমূঢ় ক্ষুদ্র সাগর পৃথিবীকে একটি অপরূপ স্বপ্ন উপহার দেওয়ার ভয়ঙ্কর চেষ্টায় আপনাকে ক্ষয় করিতেছে। সাগর রায় আর ঘুমাইবে না ;—আজ রাত্রে সে ভালোবাসিবে, আর ছন্দের বন্ধনে তাহার এই ক্ষণিক ভালোবাসাকে অসীম কালের জন্য রাখিয়া যাইবে !

৬

এবারে সাগর গা ছাড়িয়া দিল, নদীস্রোতকে ছোট-ছোট শিলা দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মানুষে করে! শিলার আঘাতে বাজিয়া-বাজিয়া স্রোতস্বিনী আরো নৃত্যশীলা, কলভাষিণী হইয়া উঠে মাত্র।

এক রবিবারে সকাল হইতে সত্যবানের দেখা নাই। খুব ভোরবেলা বিনোদ তাহাকে কলেজ-স্‌কোয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল, তারপর হইতেই সে পলাতক। একা-একা সাগর নিজকে লইয়া কি করিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এখন একবার পত্রলেখার কাছে গেলে কেমন হয়? দিনের আলোয় সে তো তাহাকে কখনো দেখে নাই! অপ্রত্যাশিত ভাবে সে গিয়া উপস্থিত হইবে;—আর পত্রলেখা—তাহার পরণে সাধারণ একখানা আটপৌরে শাড়ি, চুলগুলি অবিন্যস্ত, বিস্মিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিবে, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিবে—এ কি? আপনি?…

পনেরো মিনিট্‌ পরে কলেজ স্ট্রিটে সে একখানা বাস্‌ ধরিল। আরো পনেরো মিনিট্‌ পরে সার্কুলার রোডের মোড়ে নামিয়া সে বুঝিল, তাহার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতেছে। করুক্‌—তবু সে যাইবে।

ড্রয়িং রুমে গণেশ আর মুকুলেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সমস্ত মন বিস্বাদ হইয়া গেল। গণেশ বলিল, এই যে সাগরবাবু, কবিতা ফেলে উঠে' এলেন?

মুকুলেশ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোনো লেখা-টেকা তো আমি দেখি নি হে, কোন্‌ কাগজে বেরোয়?

সাড়া

গণেশ একবার চুলে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, আজকাল কবিতা-লেখা একটা ফ্যাশান হ'য়ে উঠেছে।

মুকুলেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিল, যা বলেছেন! এ-সব কি আর কবিতা হচ্ছে? ম্যাথু আর্ণল্ড্ যা বলে' গিয়েছে—

সাগর বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোন্-সবের কথা বল্‌ছেন?

মুকুলেশ যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিল, এই আজকালকার so-called সাহিত্যের কথা। এ নিয়েই এত জাঁক! পোপ্ পড়েছ? হ্যাজ্‌লিট্ এর—

—কিন্তু আপনি কি আজকালকার কিছু পড়েছেন?

—পড়্‌তে হয় না হে, আমাদের পড়্‌তে হয় না! কা'র যে কি দাম তা আমরা না পড়ে'ই বুঝি—

গণেশের গলা দিয়া ইঁদুরের চীৎকারের মতো একপ্রকার শব্দ বাহির হইল। ঐটাই হাসি।—পড়্‌বার মতো কিছু থাক্‌লে তো? রবীন্দ্রনাথের মতো একটি লাইন্ এরা কেউ পার্‌বে লিখ্‌তে?—'শীতের হাওয়ায় লাগ্‌লো কাঁপন আম্‌লকীর ঐ ডালে-ডালে'—আ—হা!

মুকুলেশ বলিয়া উঠিল, এ আর তেমন কি? ধরুন্—'পঞ্চশরে ভস্ম করে—"

মুকুলেশ আবেগসহকারে আবৃত্তি করিতেছিল, হঠাৎ পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। গণেশ চট্ করিয়া পকেট্ হইতে আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইল, ত্রস্তহস্তে অন্য পকেট্ হইতে পাউডার-পাফ্

বাহির করিয়া মুখে একটু ঘষিয়া লইল। পত্রলেখা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন গণেশ এক পোঁচ ফর্সা হইয়া গেছে।

পত্রলেখা হাসিতে-হাসিতে সাগরের কাছে আসিয়া বলিল, আপনি এসেছেন? এ ক'দিন শুধু আপনার কথাই ভেবেছি।

তারপর নিজে একটা সোফায় বসিয়া হাত দিয়া পাশের শূন্য স্থানটি দেখাইয়া দিয়া :

আসুন্, এইখেনে বসুন্ এসে।

সাগর সে-কথা অমান্য করিতে পারিল না। পত্রলেখার শাড়ির অঞ্চলখানা অযত্ন-ভরে সাগরের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে ;—দেশী মিলের একখানা কালোপেড়ে শাড়ি, তাহাও খুব ফর্সা নয়—গায়ে একটা ঢিলা ব্লাউজ্, চুলগুলি সব এলোমেলো ভাবে পিঠের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—আগের দিন বোধ হয় সাবান দিয়াছিল।

সাগরের মুখ ফুটিল—সত্যি?

পত্রলেখা মুখ ঘুরাইয়া সাগরের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, সত্যি নয় তো কি? আর আপনি তো—

গণেশ মাঝখানে বলিয়া উঠিল, উনি কবিতাতেই মশ্‌গুল হ'য়ে আছেন।

পত্রলেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আছেনই তো!

সাগরের মুগ্ধদৃষ্টি পত্রলেখাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

আজ যেন সাগর ভিতর হইতে কথা কহিবার একটা জোর-তাগিদ অনুভব করিতেছে—তাহা অমান্য করিবার উপায় নাই।

তড়্‌বড়্‌ করিয়া সে মুখে যা আসিল, তাহাই বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, আছিই তো। কিন্তু যদি জান্‌তেন—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে হঠাৎ কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়া বিশ্রী ভাবে থামিয়া গেল। গণেশ ও মুকুলেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল। তাহাও আবার সাগরের চোখ এড়াইল না।

তাহাকে একান্ত লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইল পত্রলেখা। উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানা ভরপূর করিয়া লইয়া খুব মৃদুস্বরে কহিল, হ্যাঁ, জানি।

সাগর তাহার নিজের বুকের উপর দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ভাবিল, সে আর-একটু পরেই মরিয়া যাইবে।

গণেশ বাঁ হাত দিয়া পিছনের কেশগুচ্ছ ও ডান্‌ হাত দিয়া পাঞ্জাবীর ইস্ত্রি ঠিক করিতে-করিতে বিনা কারণেই বলিয়া ফেলিল, আজ্‌কে আপনাকে বেশ smart দেখাচ্ছে, সাগরবাবু।

মুকুলেশ বাঁ হাত দিয়া গোঁফে তা ও ডান্‌ হাত দিয়া কানে সুড়্‌সুড়ি দিতে দিতে অকারণেই হাসিয়া উঠিল, হ্যাহ্‌, হ্যাহ্‌ হ্যাহ্‌।

যেন কত বড় একটা রসিকতা করিয়াছে এই ভাবে গর্ব্বিত দৃষ্টিতে পত্রলেখার পানে চাহিয়া গণেশ পকেট্‌ হইতে কতগুলি চকোলেট্‌ বাহির করিয়া ঘাড় নাচাইয়া বলিল, যদি দয়া করে'—

পত্রলেখা তৎক্ষণাৎ বলিল, অবিশ্যি, অবিশ্যি। বলিয়াই চেঁচাইয়া ডাকিল, এই মণ্টু, লিলি—চকোলেট্‌ খাবি তো আয়। পরমুহূর্ত্তেই স্বর নামাইয়া :

তারপর কি হ'ল, সাগরবাবু?

সহজে দমিবার ছেলে আর্টিষ্ট্ গণেশ নহে। তথাপি বলিল, আপনি একটা—

সাগর তখন পত্রলেখাকে যে-সব কথা বলিতেছে, তাহার মাথামুণ্ডু কিছু থাক্ আর না-ই থাক্, পত্রলেখা, এই যেন প্রথম মানুষের ভাষা শিখিয়াছে, ঠিক সেই ভাবে সাগরের কথাগুলি গিলিতেছে। মণ্টু আর লিলি আসিয়া চকোলেট্-গুলি লুটোপুটি করিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, পত্রলেখার সেদিকে খেয়ালই নাই। গণেশকে অগত্যা বলিতে হইল, আপনি না কাল্‌কে বল্‌ছিলেন যে চকোলেট্ আপনার খুব প্রিয়, তাই আপনার কথা স্মরণ করে'ই—

—কাল্‌কে নিশ্চয়ই প্রিয় ছিল, কিন্তু আজ্‌কে আর নেই, অন্তত এখন তো নয়ই।

মুকুলেশ—এক জায়গার জল আর-এক জায়গায় গড়াইয়া নিয়া গেল—এই যে জীবনে একটা বৈচিত্র্যের অন্বেষণ, সেটা কিন্তু খাঁটি artistic temperament-এর লক্ষণ। ডি কুইন্সি একেই বলে'ছেন—

মুকুলেশের কথাটা কিন্তু কেহ গায়ে মাখিল না। গণেশ শুধু একবার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল। তারপর আড়চোখে একবার পত্রলেখার দিকে চাহিয়া চকোলেট্ চুষিতে লাগিল।

বাস্-এ উঠিবার মুখে সাগরের সঙ্গে কন্দর্পের দেখা। কন্দর্পই প্রথম কথা বলিল, ভালো আছেন ?

সাগরের রক্তের মধ্যে তখন তুমুল তোলপাড় চলিতেছে, পত্রলেখার মুখের প্রত্যেকটি কথা সহস্রগুণ হইয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া দিয়া গুঞ্জিত হইতেছে, কন্দর্পের কথা প্রায় শুনিতেই পাইল না। কতকটা আন্দাজেই বলিল, হ্যাঁ।

—কোত্থেকে এলেন ?

ততক্ষণে বাস্ সাগরকে লইয়া প্রায় দশহাত আগাইয়া গেছে। কন্দর্প একটু আশ্চর্য্য হইয়াই ক্রমশঃ অদৃশ্যমান বাস্‌টার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পথের অরণ্যে তাহা মিশিয়া গেল।

বৌবাজারের মোড়ে সত্যবান সেই বাস্-এ উঠিল। ধুপ্ করিয়া সাগরের পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, উঃ, আর পারি নে।

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়েছে ?

—ক'দিন যাবৎ ঠিক হাঁটুর ওপর একটা ফোঁড়া উঠেছে—আজ সকাল থেকেই সেটা টন্ টন্ কর্‌ছে—তবু তো তা-ই নিয়েই কোথায় যে না গিয়েছিলাম জানি নে। সেই সক্কাল থেকে ঘুর্‌ছি—উঃ !

মুখ বিকৃত করিয়া দুই হাত দিয়া হাঁটুটা একবার চাপিয়া ধরিল।

সত্যবানের এমন কি জরুরি কাজ ছিল, যাহার জন্য এই ফোঁড়া নিয়াও তাহাকে সারা সকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করা সাগর বাহুল্য বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক উত্তর পাইত কিনা সন্দেহ। আর যদিই বা

পাইত, তবু সত্যবান যাহা বলিত, সাগরের জগতের সঙ্গে তাহার ব্যবধান এতই বৃহৎ যে সাগর তাহাতে আদৌ কোনো উৎসাহ পাইত না।

বাস্ থেকে নামিয়া সত্যবান সাগরের কাঁধে ভর্ দিয়া অতিকষ্টে চলিতে লাগিল। সাগর এক হাত দিয়া সত্যবানের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পত্রলেখার কাছ থেকে এলাম।

নিমেষে সত্যবানের যন্ত্রণা-বিকৃত মুখ অপরূপ লাবণ্যে হাসিয়া উঠিল।—কেমন আছে ও?

অতি সাধারণ, মামুলি কুশলপ্রশ্ন একটা, যে-কোনো মানুষের সম্বন্ধে প্রথমে এ-প্রশ্ন করাটাই রীতি। কিন্তু সাগর অনুভব করিল যে উহারি মধ্যে সত্যবান তাহার হৃদয়ের সবখানি ঔৎসুক্য ঢালিয়া দিয়াছে—যেন সংসারে আসিয়া খারাপ থাকার সম্ভাবনাই শতকরা নিরানব্বুই, ভালো থাকাটা কতই যেন আশ্চর্য! সাগর তাই বলিল, হ্যাঁ, ভালো আছে, ভালো, ভালো।

আবার বলিল, খুবই তো ভালো দেখ্‌লাম।

—দরজাটা খোলো না ভাই। এই যে চাবি।

সত্যবানকে দুই হাত দিয়া জাপ্‌টাইয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া সাগর জানালাটা খুলিয়া দিল। সত্যবান বলিল, হাঁটুর নীচে কয়েকটা বালিশ গুঁজে' দাও তো সাগর, কি যে হয়েছে—টান্ করে' রাখ্‌লেই ফেটে পড়্‌তে চায়। হ্যাঁ, হয়েছে—আর ঐ চাদরটা গায়ে বেশ করে'

জড়িয়ে দাও তো—বেশ ;—সিগ্রেট্ ধরিয়েছ ? দাও আমাকে একটা—পত্রলেখা আমার কথা বল্‌লে কিছু ?

সাগর বানাইয়া বলিল, তোমাকে যেতে বল্‌লে একদিন। তারপর সত্যবানের কপালে হাত রাখিয়াই চমকিত স্বরে :

তোমার তো জ্বর হয়েছে, সত্যবান। গা'টা পুড়ে' যাচ্ছে একেবারে।

—বল্‌লে ? বল্‌লে সত্যি ?

সহসা সাগরের মনে হইল যে সত্যবান প্রলাপ বকিতেছে। নহিলে, যে-সত্যবান কোনো অবস্থাতেই কোনো কথা কহে নাই, তাহার কণ্ঠে আজ এই অপার কাকুতি ফুটিয়া উঠিল কেন ? কিন্তু সত্যবানও সম্মুখে চলিতে-চলিতে হোঁচট্ খাইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে চট্ করিয়া নিজকে যেন সাম্‌লাইয়া লইল। স্থিরকণ্ঠে বলিল, জ্বরটা তা হ'লে বাড়্‌ল। নির্ম্মলা বলেছিল বটে—

এই প্রসঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনো অধিকার যেন তাহার নাই, এই ভাবে সাগর নীরব রহিল।

কিন্তু সত্যবানেরও আজ একটু মতিভ্রম ঘটিয়াছে বই কি ! হয়-তো জ্বরের ঘোরে তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি ঠিক নাই, কিম্বা পত্রলেখা তাহাকে যাইতে বলিয়াছে, এই সংবাদ তাহার বুকটাকে মোচ্‌ড়াইয়া-মোচ্‌ড়াইয়া বিকল করিয়া দিয়া গেছে। তাহা যদি না-ই হইবে, তাহা হইলে সত্যবান কেন এ-কথা বলিতে যাইবে ?—নির্ম্মলাকে তুমি চেনো না সাগর ; খুব ভালো মেয়ে।

সাগর পরম স্নেহভরে তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সত্যবান বলিয়া চলিল, আজ্‌কে সকালে কি হয়েছে জানো সাগর?

বলিয়া একটু যে থামিল, তাহা সাগর কোনো উত্তর দিবে বলিয়া নয়, আসল কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটু দম নিয়া নিবার জন্য।

—খুব ভোরে গেলাম। তখনো ওর ঘুম ভাঙে নি। দরজাটা খোলাই ছিল, তর্‌তর্‌ করে' সোজা ভেতরে ঢুকে' গেলাম। সারাটা ঘর একটা বিশ্রী গন্ধে ম-ম কর্‌ছে, মেঝেতে কয়েকটা খালি মদের বোতল আর অনেকগুলো আধ-পোড়া সিগ্রেট গড়াগড়ি যাচ্ছে, এক পাশে একটা নোঙ্‌রা বাটিতে কতকগুলো মাংস, তা'র ওপর একপাল মাছি কিল্‌বিল্‌ কর্‌ছে। দেখে আমার সারাটা গা রি-রি করে' উঠল—বুঝ্‌লে সাগর?—ঘেন্নায় রি-রি করে' উঠ্‌ল।

সাগর জিজ্ঞাসা করিল—চলে' এলে?

—আস্‌ছিলাম, এমন সময় জুতোর শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে' এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াল—চোখ দু'টো টক্‌টকে লাল, কপালের শিরা দু'টো ফুলে' গেছে। তবু হাসিমুখে বল্‌লে—'চলে' যাচ্ছ যে বড়?'

যা মুখে এলো, তা-ই বলে' ফেল্‌লাম, সাগর—জিভ্‌টাকে কিছুতেই শাসাতে পার্‌লাম না। কি বল্‌লাম জানো? জানো সাগর, নির্ম্মলাকে আজ আমি কি বলেছি?

সাগর রুদ্ধস্বরে বলিল—কি ?

—বল্‌লাম, 'এই নরকে টিঁক্‌তে পারে মানুষ ? এখানে এলে আমি তো আমি, যে-লোকটা নর্দ্দমা সাফ্ করে তা'রও দম আট্‌কে' আসে। এই চল্‌লাম আমি, আর যদি কখনো এমুখো হই, তা হ'লে পরজন্মে যেন তোমাদেরি কারুর পেটে আসি।'

তারপর আরো যে-সব কথা বল্‌লাম, তা এখন তোমাকে বল্‌তে পার্‌ব না, সাগর। অত কথা যে আমার মুখ দিয়ে বেরুতে পারে, তা কি ছাই আমিই জান্‌তাম ! নির্ম্মলা চুপ করে' দাঁড়িয়ে সব শুন্‌লে—চোখ দু'টো টক্‌টকে লাল, কপালের শিরা দু'টো উঁচু হ'য়ে উঠেছে—ভয়ানক মাথা ধরেছিল ওর—ধর্‌বে না ?—সেইখানে একখানা হাত রেখে চুপ করে' সব শুন্‌লে—সব।

তবু যেন আমার ঝাঁজ্ মিট্‌ল না। আরো বল্‌লাম—'এই কল্‌কাতাতেই আর-একটি মেয়ে আছে, সে ভদ্র ঘরের মেয়ে, তা'র চোখ অমন কুৎকুতে নয়, নাকটা তোমার মত চ্যাপ্‌টা নয়, রং মোটেও তামাটে নয়—দুধে-আল্‌তা। সে ভালো গান গাইতে পারে, তা'র কথায় বাঙাল-দিশি টান আসে না, সে চোখে-মুখে কথা কয়, ইংরিজি জানে, মদ খায় না'—

আর বলা হ'ল না, সাগর। দেখ্‌লাম, ওর লাল চোখ নিঙ্‌ড়ে-নিঙ্‌ড়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝর্‌ছে। ও কাঁদ্‌লে, সাগর—আমার জন্য কাঁদ্‌লে। আমি ওর কাছে আর আস্‌ব না বলে' ওর চোখে জল এলো। ভাব্‌তে পারো সাগর, তোমার সঙ্গে

আর দেখা হ'বে না বলে' কেউ কাঁদ্‌ছে ? ভাব্‌তে পারো, যা'কে তুমি এইমাত্র যা-তা বলে' অপমান করলে, সে ভাঙা গলায় তোমাকে বল্‌ছে, 'আমি জান্‌তাম যে তুমি চলে' যাবে। —যাও।'

ও বল্‌লে এ-কথা। ওর ভিজে দু'টি গাল দেখে আমি যেন এতটুকু হ'য়ে গেলাম, সাগর। গেলাম আর না। গুটিসুটি মেরে, ও এইমাত্র যে-বিছানা থেকে উঠে' এসেছে, সেখানে গিয়ে শু'লাম।

নির্ম্মলা বল্‌লে, 'কই, গেলে না ?'

বল্‌লাম, 'আগে তোমার কান্না থামাও। তারপর।'

ও হাস্‌লে। তারপর শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে কাজে লেগে গেল। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, জল দিয়ে ধুয়ে', ঘষে'-মেজে একেবারে তকতকে করে' তুল্‌ল। তারপর স্নান করে' একখানা ফর্সা কাপড় পরে' আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভিজে চুল চিপ্‌তে লাগ্‌ল। আমি চুপ্ করে' শুয়ে'-শুয়ে' দেখ্‌লাম।

হাসিমুখে বল্‌লে, 'এইবার স্টোভ্‌টা ধরাই ?'

আগাগোড়া ওর মাথার ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, কাল রাত তিন্‌টে অবধি মদ গিলেছে, আমি না এলে বেলা তিনটের আগে বিছানা থেকে গা তুল্‌ত না। কিন্তু তবু ও যে এত খাট্‌লে তা'র কারণ কি জানো, সাগর ? আমি যাব বলে'ও চলে' যাই নি, আর কখনো আস্‌ব না বলে' তখন-তখনই রয়ে' গেলাম—তাই ওর অত আনন্দ। আমার থাকা-না-থাকার এত মানেও আছে !

দুধ জ্বাল দিয়ে আমায় গরম দুধ খাওয়ালে ; বল্‌লে, 'তোমার শরীর ভালো নয়, চা তোমার সইবে না।'

আমি বল্‌লাম, 'তুমি যখন দিচ্ছ, তখন সবই সইবে।'

বোকা মেয়ে নির্ম্মলা, ওকে আমি যা বলি, তা-ই বিশ্বাস করে। জানে না, ওকে ঠকাচ্ছি, ভাব্‌তে পারে না সে-কথা। বলেছিল, 'গা'টা গ'ম্‌-গ'ম্‌ কর্‌ছে, এ বেলা যেয়ো না।' আমি তবু চলে' এলাম—কেন জানো ? আমি না থাক্‌লে ও হয়-তো আমার কথা ভাব্‌বে একটু, তাই।—কিন্তু জ্বরটা বেশ বাড়্‌ল—ক' দিন যেতে পার্‌ব না আর, ও ভাব্‌বে হয়-তো। ওকে একটা চিঠি লিখে' দিয়ো, সাগর।

সত্যবান থামিল। থামিল যখন, এমন ভাবেই থামিল যেন হাজার চেষ্টাতেও তাহার মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির করানো যাইবে না। সাগর চেষ্টাও করিল না। সত্যবানের শিয়র হইতে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা সে হারাইয়াছে, নীরবে বসিয়া থাকিতে-থাকিতে অশ্রুতে ভেজা একটি কুৎসিত মুখ থাকিয়া-থাকিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল ; দুইটি ছোট-ছোট চোখ শুধু একখানি অম্লান করুণা বিস্তার করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে—সত্যবানের সকল বঞ্চনা অতিক্রম করিয়া তাহা একটি সস্নেহ শুশ্রূষা বিকীরণ করিয়া সমস্ত গ্লানি মুছিয়া নিল।

বহুদিন পরে সাগর একদিন কথায় কথায় নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, তোমার কথা প্রথম যেদিন সত্যবানের মুখে শুন্‌লাম, সেদিন ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক এম্‌নিতরো হ'বে।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমাকে কেমন দেখ্‌লে ?

সাগর বলিয়াছিল, তোমাকে দেখ্‌তেই পেলাম না, নির্ম্মলা। একে খানিকটা, ওকে খানিকটা বিলিয়ে দিয়ে নিজে তো তুমি ফতুর হ'য়ে আছ! তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়ার উপায় কি রেখেছ?

নির্ম্মলা সরল ভাবে বলিয়াছিল, দেবো না! আমাদের পেশাই যে—

নির্ম্মলা সাগরের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

আজ সত্যবানের শিয়রে বসিয়া সাগর মনে-মনে নির্ম্মলাকে রচনা করিতে লাগিল, আর সত্যবান জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

৭

সত্যবানের অসুখটা যত সহজে আসিয়াছিল, তত সহজে কিন্তু কাটিয়া গেল না। পাড়া-গাঁয়ে বর্ষার জলের মতো যাই-যাই করিতে-করিতেও যাইতে তাহার কতই যেন আপত্তি! সাগর নির্ম্মলাকে যে-চিঠি লিখিয়াছিল, তাহার উত্তরে নির্ম্মলা মনি-অর্ডার করিয়া পনেরোটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। কুপনে ভাঙা-ভাঙা অক্ষরে লিখিয়াছে, কেমন আছ শিগ্‌গির জানিয়ো। সেরে উঠে'ই এখানে এসো কিন্তু। তোমাদের ওখানে মেয়েদের যাওয়া কি নিষেধ?

সাতদিন পর সেইদিন সত্যবানের জ্বরটা একটু কমিয়াছে। টাকাগুলি বিছানার চারিপাশে ছড়াইয়া সাগরের দিকে চাহিয়া বলিল, ওটা ক'ার চিঠি, সাগর?

পত্রলেখার। তারপর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিল, এতদিন যাই নি বলে' অনুযোগ দিয়ে লিখেছে।

আজ্‌কেই একবার যাও তা হ'লে।

এই কয়দিন ধরিয়া সাগরের চেতনার অণুতে-অণুতে পত্রলেখার মৃদু কণ্ঠস্বর অনুরণিত হইয়া ফিরিতেছিল তিলেকের তরেও সে তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারে নাই। পত্রলেখার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আর তাহার মনে বিন্দুমাত্র অধৈর্য্য ছিল না, ঐ একটি দিনে পত্রলেখা তাহাকে যাহা দিয়াছে, তাহা ভাঙাইয়া-ভাঙাইয়া বাকিটা জীবন সে অনায়াসে চালাইয়া দিতে পারে;—চোখে দেখিবার বা কথা কহিবার সকল প্রয়োজন এক নিমেষেই যেন মিটিয়া গেছে।

সত্যবান আবার বলিল, তুমি একটিবার যাও সাগর, বিনোদ আমার কাছে এসে বস্‌বে 'খন।

আবার পত্রলেখার দেখা পাইবার কথা কল্পনা করিতেই সাগরের মন বসন্ত-প্রভাতের ভ্রমরের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল। পত্রলেখা আবার হাসিয়া তাহার পাশে বসিবে, মিষ্টি করিয়া কথা কহিবে, মুখ নত করিয়া গোপনে শুধু তাহারই প্রীতির জন্য হাসিবে—সাগর এত সৌভাগ্য ভাবিতেও পারে না। চিঠিখানা সে আর-একবার পড়িল।

মনে-মনে কবিতা তৈয়ারি করিতে-করিতে সাগর বাহির হইয়া পড়িল।

সাগরের মনটা না ভুলাইলেই নয়, এই কথা মনে করিয়া যেন পত্রলেখা সেদিন সাজসজ্জা করিয়াছিল। একটি অতিকায় নীল ফুল যেন হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছে, পত্রলেখাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সাগরের তাহাই মনে হইল। অপরাজিতার মতো ঘন নীল রঙ্‌য়ের শাড়ি ও ব্লাউজ্‌ তাহার দেহটিকে এমন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে তাহার অন্তরালে যে রক্ত-মাসের শরীর আছে, তাহা কল্পনা করাও যেন সম্ভব নয়। অনাবৃত দু'টি বাহু দৃষ্টিকে আমন্ত্রণ করে না, বরঞ্চ বিক্ষিপ্ত করে। আঙুলের ডগাটুকু পর্য্যন্ত ঝল্‌মল্‌ করিতেছে—তাকাইলে চোখ ঝলসিয়া যায়। যেন বহুকাল ঘুমাইতে পায় নাই, চোখ দু'টি জাগরণের অসীম ক্লান্তিতে ভাঙিয়া আসিতেছে, মাথার পেছনের প্রকাণ্ড খোঁপাটিও ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া।

সাগর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই মানুষের ভাষা ভুলিয়া গেল।

কথা কহিতেও যেন তাহার কষ্ট হইতেছে, এমনি ক্ষীণকণ্ঠে পত্রলেখা বলিল, আমার চিঠি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। সত্যবানের খুব অসুখ করেছে, তাই এতদিন আসতে পারি নি।

সাগর আশা করিয়াছিল, পত্রলেখা এ-সংবাদ শুনিবামাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ; কবে অসুখ করিল, কি অসুখ, এখন কেমন আছে—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে আর কূলকিনারা পাইবে না। কিন্তু পত্রলেখা অস্ফুটকণ্ঠে একবার 'তাই নাকি ?' বলিয়াই চুপ করিল।

একটা-কিছু বলিবার জন্যই সাগর বলিল, আজ্‌কে অন্য কাউকে দেখ্‌ছি না যে!

—ভাগ্যিস্‌ দেখ্‌ছেন না। তা হ'লে এতক্ষণে কি আর চকোলেট্‌-খাওয়া বা ড্রাইডেনের সমালোচনা সুরু না হ'ত! আপনি এতদিন আসেন নি—কি সৎসঙ্গেই যে সময় কাটিয়েছি!

—কেন, কন্দর্পবাবু আসেন নি ?

—কন্দর্পবাবু ? এবার ওঁর এক্‌জামিনের বছর। বইয়ের পাতা ওল্টাতে খানিকটা সময় বাজে খরচ হয় বলে' তাঁর আপ্‌শোষের সীমা নেই।

—সেই দিন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমায় তাড়াতাড়ি বাস্‌-এ উঠ্‌তে হ'ল—বিশেষ কিছু কথা হ'তে পারে নি।

—হ্যাঁ, তিনি এসে বল্‌লেন আপনার কথা।

—তিনি তখন এখানে আস্‌ছিলেন ?

—হ্যাঁ। এসেছিলেন এই কথা বল্‌তে যে আর শিগ্‌গির

হয় তো আস্‌তে পার্‌বেন না ;—কারণ কাল থেকে তিনি রীতি-মতো পড়াশুনো সুরু কর্‌বেন।

—অদ্ভুত লোক! আর এতও হাস্‌তে পারেন!

পত্রলেখা সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, চলুন্ বায়োস্কোপ দেখে আসি। আজ্‌কে সারাটা দিন বিচ্ছিরি কেটেছে আমার ;—সকালটা কাটিয়েছি মুকুলেশবাবুর নাকী কথা আর গণেশবাবুর ন্যাকা কথা শুনে'—এঁরাও যেমন।—আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছেন। আমার কি উপায় হ'বে বল্‌তে পারেন?

সত্যবান ঐ পায়রার খোপের মতো ছোট ঘরটিতে একা-একা শুইয়া জ্বরে কোঁকাইতেছে ;—সঙ্গীর মধ্যে হয়-তো এক বিনোদ, জীবন ভরিয়া কবিতা মুখস্ত ছাড়া আর কোনো কাজ সে করে নাই। সত্যবান মনে-মনে একটা কিছু আশা করিয়াই বোধ হয় সাগরকে এখানে পাঠাইয়াছে, কতক্ষণে সে ফিরিয়া আসিবে, তাহারি প্রতীক্ষায় এখন মুহূর্ত্ত জপ করিতেছে।—এই অবস্থায় পত্রলেখাকে নিয়া বায়োস্কোপে যাওয়ার মধ্যে সত্যবানের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ অপমান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া সাগর অনুভব করিল।

কিন্তু পত্রলেখা, যেন সাগর যাইবেই, এই ভাবে বলিল, চলুন্ তা হ'লে। বেশি সময় নেই।

সাগর ক্ষীণ আপত্তি করিয়া বলিল, আমার আজ শিগ্‌গির ফির্‌তে হ'বে—সত্যবান একা পড়ে' আছে—

সাগরের এ-আপত্তি ভাসাইয়া নিবার পক্ষে পত্রলেখার

একটুখানি হাসিই যথেষ্ট।—শোফ্যরকে বলে' দেবো' খন—আপনাকে হস্‌টেলে পৌঁছে দিয়ে যাবে। কতই বা রাত হ'বে? বড় জোর সাড়ে ন'টা।

তারপর সাগরের মুখের খুব নিকটে মুখ আনিয়া:

আমি আস্‌ছি এক্ষুনি। এর মধ্যে পালাবেন না আবার!

হাওয়ায় ভাসিয়া প্রকাণ্ড নীল ফুলটি অদৃশ্য হইয়া গেল বটে, কিন্তু রাশি-রাশি ফোটা ফুলের গন্ধে সমস্ত ড্রইং রূম্ ভরিয়া গেছে—সাগরের মনও।

যে-মুহূর্ত্তে রাস্তায়-রাস্তায় গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠে, ঠিক তাহারি আগের মুহূর্ত্ত। কলিকাতা নিজের পরিপূর্ণতার ভার ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না, নিজকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া সহস্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। এ যেন কোন্ যৌবনগর্ব্বিতা নাগরিকা, সারা অঙ্গে মণি-মুক্তা ঝল্‌মলাইয়া, চুল এলো করিয়া দিয়া অজানা প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় উৎসুক, অস্থির হইয়া উঠিয়াছে;—যাহার জন্য এত আয়োজন, তাহাকে না পাইলে আকাশটাকে দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কি যে না করিবে, তাহার কোনই ঠিকঠিকানা নাই।

পত্রলেখার মোটরখানাও কলিকাতার ব্যাকুলতার স্বাদ পাইয়াছে—পথের চলমান স্রোতে গা এলাইয়া দিয়া সেও বিপুল বেগে ছুটিতেছে;—একটু দেরি হইয়া গেলেই কলিকাতা ভয়ঙ্কর

প্রতিশোধ নিতে ছাড়িবে না।' হু-হু করিয়া বাতাস লাগিতেছে, কিন্তু আজ পত্রলেখার চুল সাগরের মুখে আসিয়া পড়িবার উপায় নাই, কারণ পত্রলেখা খুব যত্নসহকারে চুলগুলিকে একটা মস্ত খোঁপা বাঁধিয়া রাশীকৃত করিয়াছে। দুইজনের মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান আছে—সাগর একটু ঘেঁষিয়া বসিবে, এমন সাহস তাহার নাই। চারিদিক হইতে কলিকাতা লোহায়-লোহায় কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—যাহারা তাহাকে জন্ম দিয়াছে, লালন করিয়াছে, এই বর্ব্বর রমণী আজ সেই মানুষদের অপেক্ষাও শক্তিশালিনী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার টুঁটি ধরিয়া চাপিয়া এ-অসঙ্গত চাঞ্চল্য থামাইয়া দিতে পারে, এমন ক্ষমতা বুঝি স্বয়ং বিধাতারও নাই!

কলিকাতার উত্তপ্তস্পর্শে সাগরের রক্তের মধ্যে তুমুল তোলপাড় লাগিয়াছে, পার্শ্বস্থিতা মেয়েটির চোখের পানেও সে আর তাকাইতে পারে না।

সাগরের বুকের ভিতর কত কথার বীজ যে তাহার রসনা-ফলকে ফলিয়া উঠিবার দুঃসহ চেষ্টায় মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সাগর যদি কোনো কথা উচ্চারণ করিত, তাহা হইলে কে-ই বা তাহা শুনিতে পাইত। সমুদ্র-গর্জ্জনের মতো কলিকাতার তুমুল অট্টরোলে সেই মৃদু, ক্ষীণায়ু কথাটি ঝড়ের মুখে হাল্‌কা একটি পাখীর পালকের মতো কোথায় যে উড়িয়া যাইত, তাহারই ঠিকঠিকানা নাই! আর, পত্রলেখাই বা আজ এমন নীরব, নিঃশব্দ কেন? যে-মেয়েটি—শুধু মুখ দিয়া নহে, দেহের প্রতি অঙ্গ দিয়া কথা কহিয়াও

নিজকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না, আজ কি তাহার মুখেও কোনো কথা জুয়াইবে না ?

বায়োস্কোপ্ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই দেরিটা যে সাগরের জন্যই হইল, এ-কথাটাও কি বলিবার মত নহে ?

লাল ভেল্‌ভেট্-মোড়া সোফায় দুইজনে পাশাপাশি বসিল। দুই সার রক্তবর্ণ আলোকভাণ্ড হইতে মুমূর্ষু গোধূলির শেষ শিখাটির মতো নিষ্প্রভ আলোকের আবীর ঝরিয়া পড়িতেছে। বেহালা আর পিয়ানোর সংযোগে একটা অত্যন্ত করুণ সুর ধ্বনিত হইয়া প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়াকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

সাগরের কি সাধ্য যে সে বায়োস্কোপ্ দেখে ? বায়োস্কোপের পর্দ্দাটিকে আড়াল করিয়া দিয়া প্রকাণ্ড একটা নীল ফুল তাহার চোখের উপর এই মুহূর্ত্তে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, তাহার কোনো-কোনো পল্লব কে যেন লাল রঙে চুবাইয়া নিয়াছে, দুই রঙের সম্মিলনে আরো লাখো লাখো রঙ্ জন্ম নিয়া রামধনুর তরঙ্গের মতো সাগরের চোখে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

পত্রলেখাও নিশ্চয়ই বায়োস্কোপ্ দেখিতে আসে নাই ;—নহিলে অমন করিয়া গা এলাইয়া দিয়া সে চোখ বুজিবে কেন !

সাগর জিজ্ঞাসা করিতে গেল, সে কোনো অসুস্থতা বোধ করিতেছে কিনা—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া যেন পত্রলেখার মাথাটি সোফার গা হইতে পিছ্‌লাইয়া সাগরের কাঁধের উপর ঢলিয়া পড়িল। সাগর সচকিত হইয়া নিজকে সরাইয়া নিবার চেষ্টা করিতেই হাতের উপর মৃদু একটু আকর্ষণ অনুভব করিল। তারপর—

তারপর কি হইল, পরদিন সকালে সাগর নিজেও তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ করিতে পারে নাই। একখণ্ড সুনীল, সুকোমল মেঘ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মধুর সৌরভ বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার চারিদিকে যেন সহসা কোন ধূম্র-নীল কুহেলিকা কি এক উন্মাদনার জাল বুনিয়া চলিয়াছিল,—এই পৃথিবীর মধ্যেই আর এক পৃথিবী—সেখানে বিধাতারও প্রবেশাধিকার নাই বুঝি! মদিরগন্ধ মেঘখণ্ড ভাঙিয়া-ভাঙিয়া তাহার দেহের সঙ্গে কণায়-কণায় মিশিয়া গিয়াছিল—তাহারই আবেশে অভিভূত হইয়া তাহার শুধু মরিতে বাকি ছিল!

শুধু এইটুকুই।

তবু, ইন্‌টার্‌ভেলের আলো যখন জ্বলিয়া উঠিল, সাগর একটা লিমোনেড্ খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল, আর পত্রলেখা অদূরবর্ত্তিনী এক পরিচিতার সঙ্গে মেরী পিক্‌ফোর্ড্ ও গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সনের সৌন্দর্য্য-গরিমার তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় পত্রলেখার মোটরখানা আসিয়া সাগরের হস্‌টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাগর নামিয়া এক পা রাস্তায় ও এক পা গাড়ির পা-দানিতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যবানকে ডেকে দেবো? দেখে যাবে একটু?

পত্রলেখার কাঁধ দুইটি ও গ্রীবাদেশ একবার যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ থাক্, ওকে বোলো না যে আমি এসেছিলাম। তারপর এদিক-ওদিক একবার চাহিয়া নিয়া:

সাড়া

শোনো—

সাগর মুখ বাড়াইতেই পত্রলেখার মুখ সেখানে এক সঙ্গে দুই-তিনটা চুমা দিয়া ফেলিল।

হস্টেলে ঢুকিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই সাগর দেখিল, উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর্ দিয়া অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া সত্যবান দাঁড়াইয়া আছে।

সোনার শিকল

১

দক্ষিণের বারান্দায় সাগর ইজি-চেয়ারে শুইয়া আছে। সারা বাড়িতে লোকজনের সাড়াশব্দমাত্র নাই। ব্যোমকেশ তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছে, আর মণিমালা—মণিমালা নিশ্চয়ই পাশের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে।

জামগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ রেখাটুকু পশ্চিমের আকাশ হইতে মুছিয়া যাইতেছে। সাগর সেইদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। চাঁদের গাঢ়-তামাটে দীপ্তি তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া হারাইয়া যাওয়ামাত্র সে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া হাতের কাছের সুইচ্‌টা টিপিল। তারপর ফের হেলান্ দিয়া তীব্র আলোর প্রথম ধাক্কা এড়াইবার জন্য চক্ষু বুজিল।

শীত ফুরাইয়া গিয়া সেদিন প্রথম দক্ষিণের বাতাস দিয়াছে। ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর সিগারেটের টিন ও ছাইদানের মাঝখানে এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া ছিল; এক দম্‌কা বাতাস আসিয়া সেটাকে উড়াইয়া সাগরের গলার উপর আনিয়া ফেলিল। সাগর চোখ মেলিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল। ও, সেই চিঠিটা।

চিঠিখানা সত্যবানের। বহুদিন পর সত্যবানের চিঠি আসিয়াছে। চিঠি লিখিতে সত্যবানের আলস্য অসীম। এবং তাহার চিঠির বিশেষত্ব এই যে তাহাতে তাহার নিজের কথা ছাড়া পৃথিবীর আর যাবতীয় কথাই থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই চিঠিখানাতে সে কোনো ঠিকানা দেয় নাই। বর্ত্তমানে তাহার বাসস্থান নাকি অত্যন্ত অনিশ্চিত; কখনো এখানে, কখনো ওখানে—ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সে দুনিয়াটাকে চাখিয়া লইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার এম্-এ পাশ করা হয় নাই; সাগরের আকস্মিক

অন্তর্দ্ধান-সত্ত্বেও পরীক্ষা সে দিয়াছিল; তাহার বিশ্বাস, ভালোই দিয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া যেন কি হইয়া গেল—

যাক্, এম্-এ ডিগ্রীটার উপর সত্যবানের এমন কিছু প্রচণ্ড লোভ ছিল না। কিন্তু ফলে অন্ন-সংস্থানের আন্দাজ একটা কাজকর্ম্ম জুটাইয়া নিতে তাহার বিলক্ষণ বিলম্ব হইতেছে। সেই কারণেই জীবনযাত্রানির্ব্বাহের এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত। সাগরের মতো বড়লোক-বাবা তো আর সকলের থাকে না।

তা থাকে না, কিন্তু তার চেয়েও কম থাকে—সাগর ভাবিল —তার চেয়েও কম থাকে নির্ম্মলার মত—বন্ধু, হাঁা বন্ধু ছাড়া আর কি? পরিশেষে সত্যবান জানাইয়াছে যে তাহাকে চিঠিপত্রাদি লিখিবার ঠিকানা অত নম্বর অমুক গলি।

নির্ম্মলার ঠিকানা। অথচ এ-কথাটা কেন যে খোলাখুলি লিখিবার সাহস সত্যবানের হইল না, এ-কথা মনে করিয়া সাগরের হাসি পাইল। সাগর ভাবিল, সত্যবান ইচ্ছা করিলেই বিবেককে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া আরো অনেক কথা লিখিতে পারিত। লিখিতে পারিত, নির্ম্মলা আমার খাওয়া-পরা, সেবা-শুশ্রূষা যত্ন-পরিচর্য্যা সমস্ত-কিছুর ভার লইয়াছে; নিশ্চিন্ত আরামে আমার দিন কাটিতেছে; বেকার লোকের পক্ষে আক্ষেপ করা স্বাভাবিক বলিয়াই আমাকে করিতে হয়—লোক-দেখাইবার জন্য—নহিলে আমার অভাব কিসের!

অদ্ভুত মেয়ে এই নির্ম্মলা! সাগর তাহাকে কখনো দেখে নাই। শুনিয়াছে, চেহারা নাকি তাহার রীতিমত কুৎসিত। সত্যবানের মুখেই শুনিয়াছে।

সত্যবান পত্রলেখাকে গোড়া থেকেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই নির্ম্মলাকে আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়া গেল। সাগর ছিল শিশু, সেই জন্যই—যাক, পুরোনো জিনিষ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। উপরন্তু, পত্রলেখা-যুগের পর এত সময় কাটিয়া গেছে, এত ঘটনা ঘটিয়াছে যে, সে-বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে চিন্তা করা তাহার পক্ষে এখন সম্ভব হইয়াছে। মণিমালাকে সে যেদিন বিবাহ করিল সেইদিনই তো মনে-মনে শপথ করিয়া পত্রলেখাকে সে তাহার জীবন হইতে বিদায় দিয়াছে। এখন আর তাহার মনে অনুরাগ-বিরাগের বালাই নাই, তাই সমালোচনায় প্রকৃত অধিকার তাহার জন্মিয়াছে।

পত্রলেখার সঙ্গে কন্দর্পর বিবাহ হইয়া গেছে, সত্যবানের চিঠিতে এই খবর জানিয়া (আশ্চর্য্য, না?) সাগরের মনে লেশমাত্র আবেগের সঞ্চার হয় নাই। কন্দর্প বি-সি-এস্-এ ফার্স্ট হইয়া ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটগিরি বাগাইয়াছে, পত্রলেখা সুখেই থাকিবে। সাগর আজ সহসা আবিষ্কার করিল, পত্রলেখা-পুষ্পকে ঘিরিয়া যে কয়টি ভ্রমর গুঞ্জন তুলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কন্দর্পকেই তাহার যা একটু ভালো লাগিত। কালই নব-দম্পতীর জীবনে অজস্র সুখ-কামনা করিয়া এক চিঠি লিখিতে হইবে। যা-ই হোক, পত্রলেখা চুকিল। কন্দর্পকে সে প্রশংসা করে, যে-মেয়েকে নিয়া একটা 'কেলেঙ্কারি' হইয়া গেছে তাহাকে বিবাহ করিতে—কই, মুকুলেশ তো অগ্রসর হইল না! যাক, পত্রলেখার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ;—যেন মস্ত একটা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া সাগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

গণেশ নিশ্চয়ই বিবাহের পরদিন হইতে পত্রলেখাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে ও নানা স্থূল উপায়ে কন্দর্পর মন জোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে! বেচারা গণেশ!

পত্রলেখার সম্বন্ধে গণেশই কিন্তু প্রথম তাহার চোখ খুলাইয়া দেয়। গণেশকে সে সেদিন বিদ্বেষ-বিষাক্ত ও হিংস্র-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া মনে-মনে বিস্তর নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, একটা নিরেট ইডিয়ট্ বই গণেশ আর কিছুই নয়। যে-দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহাতে গণেশের তো কোনোই হাত ছিল না! অপরাধের মধ্যে সে নির্ব্বোধের মত শুধু ভাবিয়াছিল যে সাগর ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়াই সে মস্ত একটা বাজি মারিয়া দিল! কিন্তু সকল দোষের মধ্যে নির্ব্বুদ্ধিতাই সব চেয়ে ক্ষমার যোগ্য নয় কি? কেননা, সখ করিয়া কেহ নির্ব্বোধ হয় না, না হইয়া পারে না বলিয়াই হয়।

গণেশ যে নিজমুখে তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিয়াছিল, গণেশের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। বলিয়া গণেশ সুখ পাইয়াছিল, শুনিতে-শুনিতে সাগরের মুখ যে পর-পর শাদা ও লাল, লাল ও শাদা হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া সে ততোধিক সুখ পাইয়াছিল। তুমুল তোলপাড়ের পর সেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম্ তখন শান্ত—ফ্যান্-এর স্বল্প-গুঞ্জন আজিও সে শুনিতে পায়। গণেশের মিহি মেয়েলি কণ্ঠস্বর চাপা গলায় কথা বলার দরুণ অদ্ভুত শোনাইতেছিল। সাগর আগাগোড়া শুনিল, একটি কথাও বলিল না; তারপর উঠিয়া ছোট বাগানটি পার হইয়া ধীরে-ধীরে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। ছোট ফটকটি হাত তুলিয়া

প্রতিদিনকার মত খুলিতে হইল—সেই ফটকটি আর সে ছোঁয় নাই।

বিকালবেলা গণেশ আসিয়া নীচে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। সিঁড়ির পাশের ছোট ড্রেসিং রুম্-এ নারী-কণ্ঠের কথা শুনিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর হঠাৎ সাগরের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ঈর্ষামিশ্রিত (এটা সাগরের অনুমান) কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে ভেজানো দরজার গায়ে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল;—সোজা বাঙ্‌লায় বলিতে গেলে আড়ি পাতিয়াছিল. গণেশের মত পুরুষের পক্ষেই আড়ি-পাতা সম্ভব! শুনিল, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিতেছে, আজ্‌কে; বুঝ্‌লি লেখা?

একটু পরে পত্রলেখার উত্তর আসিল, হুঁ। তুমি পর্দ্দার বাইরে থেকো—না, মা, রুজ্ নয়। বুঝ্‌তে পার্‌লে হয়-তো—

থাক্ তবে। সাগরের বাড়ির অবস্থা জেনেছিস্ তো খোঁজ নিয়ে? ওর বাবা—রিটায়ার্ড্ এস্-ডি-ও—মন্দ কি? একটিমাত্র ছেলে যখন! ঢাকাতে বাড়ি কিনেছেন—ভালোই তো। তবে ছেলেটির মা নেই—

So much the better. Mothers-in-law are awful.

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির হাসির শব্দ শোনা গেল,—তা সাগর দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, লেখাপড়াতেও ভালো নাকি—তবে বড্ড ছেলেমানুষ।

তা নয় তো কি? বয়েসে তো আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট।

তা আর কি হয়েছে ? ছেলেমানুষ বলে'ই তো অত সহজে বাগিয়ে আনা গেছে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তো ভয় হয়, কখন্ ফস্‌কে যায়। ও একবার হাত-ছাড়া হ'লে আবার ক' বছরের ধাক্কা, কে জানে ? আমাদের সমাজে মেয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দিন-দিনই কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছে। আর, মনে হয়, আজকাল ছেলের চাইতে মেয়েই জন্মাচ্ছে বেশি।

Lily-of-the-valleyটা দাও, মা। ওটা ওর পছন্দ।

তোর সব মনে আছে তো, লেখা ?

তোমার কোনো ভয় নেই, মা। তুমি দেখো।

এর পর, কোনো ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করতে রাজি না হ'য়ে পারে না। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

এম্‌নিতেও হ'ত হয়-তো—

তবু—you never can tell. চারদিকে কালো চোখ—

কিন্তু মা, তুমি যে কাছাকাছি আছ, সাগর যেন তা কোনমতেই টের না পায়। ও আবার যে লাজুক !

পাগল হয়েছিস্ ?...Manicure-setটা কে নিয়েছে রে ? লিলি বুঝি ? একটু বোস্, আমি নিয়ে আসছি—

গণেশ পা টিপিয়া-টিপিয়া নীচে নামিয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল আর ফিরিল রাত নয়টার পর, যখন সাগর বিমূঢ়, অভিভূত, আবিষ্ট, নিস্তব্ধ হইয়া একাকী নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

তাহারি একটু আগে প্রচণ্ড বাক্-বিতণ্ডার পর মিসেস্ চ্যাটার্জি পত্রলেখাকে লইয়া উপরে গেছে, এবং যাইবার সময়

শাসাইয়া গেছে যে সাগর যদি এখনো ভাবিয়া না দেখে তবে সে তাহার নামে মাম্‌লা আনিবে।

অথচ সাগরের অপরাধটা বলিতে গেলে কিছুই না। যে-মেয়েকে তুমি ভালোবাসো বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ, সে যদি একদা সন্ধ্যাকালে তোমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের কাছে মুখ বাড়াইয়া আনে, তাহা হইলে তাহাকে চুম্বন না করাই বরঞ্চ পাপ। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্তা মেয়ের মা-কে আসিয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইতে হইবে, এমন কথা কোনো দেশের নীতি-শাস্ত্রেই লেখে না।

মিসেস্ চ্যাটার্জির অবাধ ও সুতীক্ষ্ণ বাক্‌পটুতা শুনিয়া সাগরের তখনই কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে এই ঘটনার মূলে কোনো চক্রান্ত আছে। ক্রমে সে অবগত হইল যে, 'after this' পত্রলেখাকে নাকি তাহার বিবাহ করিতেই হইবে।

কেন যে সাগর তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল না, ইহা এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার। মিসেস্ চ্যাটার্জির মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহার তো আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার কথা, কিন্তু, কি কারণে সে ঠিক জানে না—বোধ হয়, 'করিতেই হইবে' এ-কথা শুনিয়াই সাগরের মন বাঁকিয়া বসিল। যাহাকে দুর্লভ দুর্ম্মূল্য জ্ঞানে সে এতকাল পরমযত্নে ধ্যান করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে পণ্যদ্রব্যের মত শস্তায় বিকাইতে দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা দারুণ গ্লানিতে বিমুখ হইয়া উঠিল।

তবু সেই চুম্বনের স্বাদ তাহার মুখে এখনো লাগিয়া

রহিয়াছে—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে একবার পত্রলেখার দিকে তাকাইল। সেই মুহূর্ত্তে যদি পত্রলেখা একটু অন্যমনস্ক হইয়া না পড়িত, যদি তেমনি অভ্যস্ত নিপুণতার সহিত অনুরাগে-অনুরোধে গভীর একটি দৃষ্টি সাগরকে পাঠাইতে পারিত, তাহা হইলে সাগরের সমস্ত জীবনটা বদ্‌লাইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পত্রলেখা তখন মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া গূঢ় ইঙ্গিত-মিশ্রিত ঈষৎ হাসি হাসিতেছে। দেখিয়া সাগরের সমস্ত শরীর কাঠ হইয়া গেল। চক্ষের নিমেষে, একটু পরে গণেশের মুখে সে যে-ঘটনার আবৃত্তি শুনিয়াছিল, তাহা বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক সুস্পষ্টতা লইয়া তাহার চোখের সামনে খেলিয়া গেল। তাই তো সে দারুময় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিল—না।

গণেশ-সংবাদের পর সে-রাত্রে কি করিয়া সে যে হস্‌টেলে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার মনে নাই।

সত্যবানের ঘরে তখন পূরা দমে আড্ডা চলিয়াছে। উপস্থিত কণ্ঠগুলির সম্মিলিত একটা উচ্চহাসির মধ্যে উন্মাদের মত সাগর সে-ঘরে ঢুকিয়া অর্দ্ধ-শায়িত সত্যবানের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, তুমি আমাকে আগে বলো নি কেন, সত্যবান? কেন তুমি আমাকে আগে বলো নি? বলিয়া কাঁদিয়াছিল। (সাগরের হাসি পাইল)

—তারপর যে-কয়দিন সে কলিকাতায় ছিল, তাহার স্মৃতি—জ্বরের সময়ে মুখে একটা বিশ্রী স্বাদের মত তাহার মনে লাগিয়া রহিয়াছে। মুমূর্ষু পশুর মত অর্দ্ধ-চেতন মন ও অকর্ম্মণ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি লইয়া সত্যবানের বিছানায় সে দিন-রাত পড়িয়া

থাকিত—কখনো খাইত কিনা, মনে পড়ে না; ঘুমাইত যখন, তখনো ভুলিতে পারিত না, সে ঘুমাইতেছে। আড্ডাটি চুরমার হইয়া গেছে, সত্যবান-শিষ্যদের মহলে শোকের অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে—মৃত্যু-শোক, সাগরের প্রথম মৃত্যুর।

কথাটা সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। যুবকদের মধ্যে ইহা লইয়া উন্মত্ত আলোচনা চলিল—লোকের চোখে ব্যাপারটি এমন রূপ ধারণ করিল—যেন সাগর 'মেয়েটি'র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়া এখন বিবাহবন্ধন হইতে কাপুরুষের মত পলায়ন করিয়াছে। তাহার নিন্দায় গোলদীঘি ও তার আশে-পাশের চায়ের দোকানগুলি সজীব হইয়া উঠিল।

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া রোগী যেমন অসাবধান পরিজনদের মুখে তাহার ব্যাধি-সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা শুনিতে পায়, অথচ এমন ভাব দেখায়, যেন সে কিছুই জানে না, সাগরের কানেও তেম্‌নি বাহিরের জগতের কোলাহল অস্পষ্ট, অপরিচিত ধ্বনির মত আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল, কিন্তু সে একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না, কোনো মতামতই দিল না। এ-পরাজয়, এ-অপমান মিসেস্ চ্যাটার্জির বিষম লাগিয়াছে, সে নাকি বাস্তবিক মাম্‌লা আনিত—যদি না কন্দর্প তাহাকে বুঝাইয়া বলিত যে আইনের অণুবীক্ষণে আত্মসমর্পণ করিলে শত্রুর যত না লাঞ্ছনা হইবে, তাহার চেয়ে বেশি উদ্‌ঘাটিত হইবে নিজেদের কেলেঙ্কারি। কথাটা সারবান। নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভদ্র-পরিবারের পক্ষে আইনের দ্বারস্থ হওয়া অসম্ভব বলিয়া কত স্কাউণ্ড্রেল্ যে নিশ্চিন্ত চিত্তে চলাফেরা করিয়া বেড়ায়,

এ-কথা চিন্তা করিয়া সমাজ-হিতৈষীগণ বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন।

সাগর শুইয়া-শুইয়া মনে করিতে চেষ্টা করিল, এই ঘটনার সঙ্গে সে কোনোভাবে জড়িত কিনা। সাগর রায় যেন কখনো জন্মগ্রহণ করে নাই ; পত্রলেখা—কে সে ?

চতুর্থ দিন সাগর একটু সুস্থবোধ করিল। সেদিন যে সে চা ও সিগারেট খাইতে পারিয়াছিল, ইহা তাহার মনে আছে। সত্যবান তাহাকে বলিল, তুমি আজই ঢাকা চলে' যাও, সাগর।

আশ্চর্য্য! এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সাগর রায় নিজকে ফিরিয়া পাইল। যে-অসাড়তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা নিমেষে অপসারিত হইয়া গেল, অন্ধকারে আততায়ীর ছুরির মত তাহার গত কয়েক বছরের জীবন একটি নিবিড় মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে নিষ্ঠুর আঘাত করিল। এতক্ষণ তাহার আড়ষ্ট চেতনা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার কথা ওঠা মাত্র অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার বুক টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

সত্যবান আবার বলিল—তুমি আজই চলে' যাও, সাগর।

তারপর সত্যবান তাহার সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিল—সাগর যখন প্রথম আসে, এই জিনিষগুলি সে-ই খুলিয়াছিল। বিকালের দিকে ঢাকার একখানা টিকিট্ আনিয়া সাগরের হাতে দিয়া বলিল, তোমার জামার পকেটে কিছু টাকা রেখেছি।

সাগর তখন সত্যবানের মুখের দিকেও তাকায় নাই, কিন্তু তাহার পর সে আর সত্যবানের দেখা পায় নাই। ঐ কথা বলিয়াই সে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আজ আবার তাহার সত্যবানকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

বিনোদ গায়ে পড়িয়া সাগরকে তুলিয়া দিতে স্টেশনে আসিয়াছিল। বিনোদকে সে কোনোকালেই বিশেষ আমল দেয় নাই, কিন্তু বিনোদের নীরব উপাসনার সে কোনো প্রতিদান দেয় নাই বলিয়া আজ সে অনুতপ্ত। গাড়ি ছাড়িবার দেরি ছিল ;—কাম্‌রার জানালায় হাত রাখিয়া বিনোদ দাঁড়াইয়া—সত্য, তাহাকে একটু বোকার মত দেখাইতেছিল। এই ঘটনা সাগরকে তাহার চোখে আরো অনেকখানি উপরে তুলিয়া দিয়াছে ; সাগর বুঝিতে পারিল, বিনোদের চোখে সে মস্ত এক-জন হিরো, চাই কি, মার্টার হইয়া দেখা দিয়াছে—এবং ইহাতে, সাগর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সাগর আজ এতই মহান্ যে বিনোদ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পর্য্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছে ; সাগরের চরাচরব্যাপী বিশাল দুঃখের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ সুখের পরিতৃপ্ত জীবন নিতান্ত ক্ষুদ্র, অশোভন ঠেকিতেছে—বিনোদের মুখে অন্ন যে এখনো সুস্বাদু, ইহাও যেন সে অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে।

সাগর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ভাবিল—কতক্ষণে গাড়ি ছাড়িবে।

অবশেষে ঘণ্টা দিল। বিনোদ হঠাৎ কাম্‌রার মধ্যে মুখ বাড়াইয়া আবৃত্তি করিল :

দেবতা, তোমার মূর্ত্তি যাহারা গড়ে,
তা'রাই ভাঙিবে পুন,
যে রেখেছে তোমা' অন্ধকারের ঘরে—
তুমি তা'র কথা শুনো।

সাগরের সন্দেহ হইল বিনোদ এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই কয়টি লাইন্ তৈয়ারি করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় গাড়ি চলিতে সুরু করিল। বিনোদের প্রসারিত ব্যগ্র হাতের মধ্যে তাহার হাতখানা একটি গাঢ় চাপ অনুভব করিল। হঠাৎ বিনোদ সাগরের কাছে রক্তমাংসের একজন প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিল। তাহার স্নেহ ও সহানুভূতিরও মূল্য আছে—সে-ও হাতের একটি চাপে স্নেহ এবং সহানুভূতি এবং সান্ত্বনা জানাইতে পারে। সাগরের ইচ্ছা হইল, বিনোদকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে একটু আলাপ করে, কিন্তু বিনোদ তখন হ্যারিসন রোড্ ধরিয়া হাঁটিতেছে, এবং সাগরের গাড়ির পাশ কাটাইয়া এই মাত্র একখানা ডাউন-ট্রেইন্ বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া গেল।

বিনোদের উচ্চারিত লাইন্ দুইটি কি এক কৌশলে যেন তাহার স্মরণ-শক্তিতে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল ;—পরের দিন সকালে স্টিমারে উঠিয়া তাহার মনে পড়িল :

দেবতা, তোমার মূর্ত্তি যাহারা গড়ে,
তা'রাই ভাঙিবে পুন

পরের লাইন্ দুইটি সে বিশ্বাস করে নাই। অন্ধকারের ঘরে কেহ তাহাকে রাখে নাই ; একজন তাহার মূর্ত্তি রচনা করিয়া

ভাঙিয়াছে বটে! তারপর, দুঃখ-সম্বন্ধে যৌবনের যে মূঢ় অহঙ্কার আছে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া সে খান্‌সামাকে ডাকাইয়া এক বোতল হুইস্কি আনাইয়া বসিল। সাগর রায়ের রক্ত প্রথম ব্যভিচারের স্বাদ জানিল।

দুই মাস পরে যাহার বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার কথা, সেই ছেলের আকস্মিক আবির্ভাবে ব্যোমকেশ একটু বিস্মিত হইল বই কি! তার উপর, সাগরের চেহারায় দুঃখের যে-পবিত্র ম্লানিমা থাকিবার কথা, হুইস্কির সাহায্যে তাহা রুক্ষ কদর্য্যতায় পরিণত হইয়াছে। ব্যোমকেশ ছেলের কপালে হাত রাখিয়া বুঝিল—জ্বরে শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

একটা জিনিষ ভালো হইল। যে-কথা সাগর মুখ ফুটিয়া কিছুতেই বাবাকে বলিতে পারিত না, জ্বরের প্রলাপে তাহা জানানো হইয়া গেল। ব্যোমকেশ যে-সব অসম্বদ্ধ তথ্য শুনিল, অল্প চেষ্টা করিয়াই তাহা হইতে সম্পূর্ণ কাহিনীটি রচনা করিতে সে সক্ষম হইল। ব্যোমকেশ পরে সাগরকে বুঝিতে দিয়াছে যে কিছুই তাহার অজানা নয়, কিন্তু ঐ ব্যাপার নিয়া খোলাখুলি কোনো আলাপ সে কখনো করে নাই।

রোগারোগ্য! শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তি। উভয়ে মিলিয়া সুখ। উয়ারিতে তাহাদের বাড়িটি ছোট, কিন্তু ভারি সুন্দর। মস্ত আঙিনা ও ঢের গাছপালা আছে। ব্যোমকেশ দুইটা বিলাতি কুকুর পুষিতেছে—মেয়েটার নাম বিউটি, তাহার শীঘ্রই সন্তান জন্মিবে। সাগর বিউটির প্রেমে পড়িয়া গেল ও উৎসুকচিত্তে তাহার সন্তানটির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নির্জ্জন, শান্ত পাড়াটি! পেন্‌শন্ নিবার পর ব্যোমকেশ জ্যোতিষবিদ্যা চর্চ্চা করিতেছে—সাগর সুবিধা পাইলেই তাহার জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করে।

যথাসময়ে বিউটির সন্তানের আবির্ভাব হইল। পুরুষ। সাগর তাহার নাম রাখিল—ফাউস্‌ট্। এখন ফাউস্‌ট্ তাহার নিত্য সহচর।

এইভাবে ছয়মাস কাটিবার পর ব্যোমকেশ হঠাৎ একদিন তাহার বিবাহের কথা পাড়িল। সাগরের মন তখন অত্যধিক আরামে এমন বৈক্লব্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে ক্ষণকালও চিন্তা না করিয়া সে মত দিয়া ফেলিল। উয়ারির এই বাড়িতেই তো তাহার জীবন কাটিবে—বাকি জীবন। আর-কোনো পরিবর্ত্তন নাই, আর কোনো ঝড়-ঝাপট সহিতে হইবে না। উদ্বেল জীবনের স্বাদ সে জানিয়াছে—এইবার শান্ত, মধুর সাংসারিকতা! সেখানেও কবিতা আছে।

সারা গায়ে রূপ ও অলঙ্কার ঝল্‌মলাইয়া যে-মেয়েটি আসিল, তাহার নাম মণিমালা। মাত্র চার মাস! অথচ সে ভাবিয়াছিল, সমস্ত জীবন!

সাগর একটা সিগারেটের জন্য হাত বাড়াইতে গিয়া দেখিল, সাম্‌নে মণিমালা।

আজ এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় অতীত জল্পনার ক্লোরোফর্ম্-এ লুপ্ত-চেতন হইয়া বসিয়া থাকিতে তাহার দিব্যি আরাম লাগিতেছিল, তাই মণিমালাকে দেখিয়া বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে?

মণিমালা ধুপ্ করিয়া ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, এই তো এইমাত্র। ও-বাড়ির মিনু আজ প্রথম শ্বশুর-বাড়ি থেকে এলো—বর এসেছে সঙ্গে। চমৎকার দেখ্‌তে ছেলেটি—চোখে-মুখে কথা বলে। মিনু যা এক-ছড়া হার পেয়েছে—চমৎকার। খাঁটি মুক্তো। হাজার টাকার ওপরে নাকি দাম—কা'র চিঠি ওটা ?

সত্যবানের চিঠিটা সাগরের কোলের উপর পড়িয়া ছিল, মণিমালা সেটা ছোঁ মারিয়া নিবার জন্য হাত বাড়াইতেই সাগর সেটা তুলিয়া জামার পকেটে পূরিল। বলিল—ও আমার কাজের চিঠি—তোমার দেখে লাভ নেই। বলিয়াই মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। এই চার মাসে স্ত্রীকে কিছু কিছু চিনিবার সুযোগ তাহার হইয়াছে। সে যদি তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে চিঠিটা তুলিয়া দিত, তাহা হইলে কোনো গোলমালই বাধিত না, মণিমালা চিঠিটাকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিত। কিন্তু এই বাধাটুকু দিয়া সে চিঠিটার প্রতি যে-প্রাধান্য আরোপ করিল, তাহাই মণিমালার মনে সন্দেহের সঞ্চার করিবে ;—মণিমালা অভিমান করিবে, রুষ্ট হইবে, আহত হইবে—অত্যন্ত বিশ্রী একটা গোল পাকাইয়া তুলিবে, সহস্র কৈফিয়ৎ দিয়া বা শপথ করিয়াও তাহাকে শান্ত করা যাইবে না। অথচ—এখন চিঠিটা না দেখানোও আর সম্ভব হইবে না।

হইলও না। মণিমালা পকেটে হাত দিয়া তাহা ছিনাইয়া আনিল,—সাগর কোনো বাধা না দিয়া এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিল যে চিঠিটা দেখাইবার উদ্দেশ্য তাহার আগাগোড়াই

ছিল, রহস্যচ্ছলে একবার বাধা দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝিল, তাহার ছলনা সিদ্ধকাম হয় নাই। পুরুষের শক্তির যাহা সব চেয়ে বড় পরিচয়, সেই দাম্পত্য-বৈষম্যের এক পালার জন্য প্রস্তুত হইতে সে মনকে শানাইতে লাগিল।

অত্যন্ত ধীরে-ধীরে পড়িলেও চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগিতে পারে না। সাগর সেইটুকু সময় অপেক্ষা করিল। কিন্তু তবু মণিমালা চোখ তুলিতেছে না। সাগর বুঝিল যে মণিমালা চিঠিখানা আবার পড়িতেছে। আরো পাঁচ মিনিট কাটিলে পর সাগর চেষ্টাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বলিল, পত্রলেখা কল্‌কাতায় আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো—সেই সময় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়।

তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত করিয়া বলিল, ওদেরকে একটা-কিছু না পাঠালে ভালো দেখায় না। কন্দর্পবাবুর সঙ্গেও আমার আলাপ ছিল। কিন্তু কথাগুলি বলিবার সময়ই সাগর বুঝিতেছিল, সে যে মিথ্যা বলিতেছে, মণিমালা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া নিয়াছে। কোন্ শয়তানের পরামর্শে সে এই মিথ্যাচরণ করিতে গেল? তাহার যে সত্য গোপন করিবার প্রয়োজন হইল, ইহাই কি তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কৌশলে পলাইতে গিয়া সে কিনা ফাঁদে পা দিয়া বসিল! ছি-ছি—এমন অবিবেচনার কাজ সে কি করিয়া করিতে পারিল? এতক্ষণ তবু যা একটু আশা ছিল, তাহাও তো উবিয়া গেল! মনের গোপন পাপ ঢাকিতে গিয়া একেবারে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, লুকাইবার চেষ্টা

না করিলেই তাহা সব চেয়ে নিরাপদে গোপন থাকিত। বিষের শিশি সর্ব্বদা নিয়তব্যবহার্য্য চাবিহীন ড্রয়ারে রাখিতে হয়।

মণিমালা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ? প্রেসিডেন্সী কলেজে কখনো মেয়ে পড়ে?

এইবার একটু সাহস পাইয়া সাগর বলিল, কেন পড়্‌বে না? —যদি সিটিতে, স্কটিশ্‌ চার্চ্চ্‌-এ—

সাগর প্রার্থনা করিতেছিল, মণিমালা যেন কলহে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু মণিমালা একটু রাগের ভাবও দেখাইল না। সাগর বুঝিল, কপালে তাহার অনেক দুঃখ আছে।

মণিমালা ধীরে-ধীরে চিঠিটা ভাঁজ করিয়া খামে ভরিয়া সাগরের পকেটে ফেরৎ রাখিয়া দিল। তারপর উঠিয়া অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া সেদিনের খবরের কাগজের ভাঁজ খুলিল। তাহার মুখে লেশমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন নাই।

এই সামান্য চিঠিটা তাহার এত দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে, তাহা কে জানিত? মোটের উপর মণিমালাকে তাহার ভালো লাগে। মণিমালার মস্ত একটা গুণ এই যে তাহার চেহারা সুন্দর। সাগরকে ভুল-বোঝা মণিমালা যদি তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া না তুলিত, তবে তাহাকে ভালোবাসাও সাগরের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মণিমালার কটিতট যেন হাতের মুঠায় ভরিয়া রাখা যায়;—কেন সে তাহার পাশ হইতে উঠিয়া গেল? যে-অতীত মরিয়া গিয়াছে, তাহার অলীক ভূত আসিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছে—অথচ হাতের একটু ঠেলা দিলেই তাহা কোথায় উড়িয়া যায়!

চেষ্টা করিলে মণিমালাকে নিয়াও কাব্য-রচনা করা যায় বই কি! আজ সাগরের বিশেষ করিয়া ক্লান্ত লাগিতেছে, মণিমালা আসিয়া শুধু তাহার পাশে বসুক্, সে যদি না চায়, সাগর না-হয় বাহু বাড়াইয়া তাহার কোমর না-ই জড়াইল! উহার ছোট, নরম হাতখানি হাতের ভিতর টানিয়া নিতে তো কোনো দোষ নাই! গালের উপর গাল—স্বামী-স্ত্রীদের যেমন রীতি! বড় বেশি আইডিলিক্, ছেলেমানুষি—না? তা হউক্, আইডিল্-ই তাহারা রচনা করিবে—সম্ভব হইলে কে না করে? মণিমালা নম্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুক্ না—'পত্রলেখাকে তুমি ভালোবাস্‌তে?'—সাগর তাহাকে সবই বলিতে পারে, কিছুই গোপন না করিয়া। কিন্তু আজই শেষ। কাল হইতে কেহ পত্রলেখার নাম মুখে আনিবে না; আর যদি নিতান্তই আনিতে হয়, সোজাসুজি নামটা উচ্চারণ করিবে—কোনো লুকোছাপা করিবে না। দশজনের মত পত্রলেখাও একজন মানুষ মাত্র—তাহার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু মণিমালা শান্তমুখে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছে। সাগর গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার অসম্ভব চেষ্টা করিল না। সাগর অপেক্ষা করিতে জানে।

খাইতে বসিয়া মণিমালা ব্যোমকেশের সঙ্গে বাগানের পরিচর্য্যা-সম্বন্ধে আলাপ করিল; আহারান্তে বহুক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সেলাই করিল (কোনো দরকার ছিল না)। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া সাগরের একটি জাপানী হক্কু কবিতা মনে পড়িল:

We are unhappy
In our lonely house;
I beat myself,
You beat yourself.

নাঃ, দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াই গেল, তখন যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না-করার কোনো কারণ নাই! সবটা জানিলে মণিমালা নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। সাগরের প্রেম মণিমালাকে চায়;—প্রেমের অজস্রতা দিয়া সাগর মণিমালাকে সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া লইবে—মণিমালা শুধু তাহাকে একটু অবসর দিক্!

সেই রাত্রে সাগরের শৈশব-স্বপ্ন তাহার নিদ্রায় ফিরিয়া আসিল।

এবার আর তুষার নয়, রুক্ষ কঙ্করাকীর্ণ ধূসর একটি পর্ব্বত—চারিদিকে ভূমির তরঙ্গিত সমুদ্র আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও একটু হরিৎ-চিহ্ন নাই;—মাটিতে ধূসর বালু-তরঙ্গ, আকাশে দগ্ধ পাংশুতা—অফুরন্ত ভূমি ও অসীম আকাশের মাঝখানে পর্ব্বতটিকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। পর্ব্বতের চূড়ায় শুভ্র একটি মূর্ত্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—পাদমূলে দাঁড়াইয়া সাগর ভাবিতেছে—সে উঠিতে আরম্ভ করিবে কিনা।

পাহাড়টা বেশি খাড়া নয়—সাগর ভাবিতেছে, সে এক দৌড়ে একেবারে চূড়ায় উঠিয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু উঠিতে আরম্ভ

করা মাত্র তাহার পা খালি ফস্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। তবু চেষ্টা করিয়া সে উঠিতে লাগিল। সহস্র কাঁকরে পা কাটিয়া গেল, ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে উঠিতেছে, কিন্তু সে যতই উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টিও ততই উঁচু হয়—আর সেই শুভ্র মূর্ত্তিটি ছবির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ মূর্ত্তিকে তাহার ধরা চাই-ই।

দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত সে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যতই চলে, পথ আর ফুরায় না। তাহার ও সেই মূর্ত্তিটির মাঝখানকার ব্যবধান কিছুতেই কমিতেছে না,—পাহাড়টি অবিশ্রান্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

তাহার সমস্ত শরীর ভাঙিয়া আনিতেছে—পা কাটিয়া রক্ত ছুটিতেছে। পরিশ্রান্ত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া সে একটু থামিল। সেই শুভ্র মূর্ত্তি তখনো নিশ্চল—কিন্তু সাগর জানে যে তাহা সজীব।

পা আর চলে না;—হামাগুড়ি দিয়া সে একটু-একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পর্ব্বতটিও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতেছে। ক্রমে তাহা আকাশ ধর-ধর হইল। সাগর ভাবিল, এইবার আকাশের গায়েই তো আট্‌কাইয়া যাইবে—আর বাড়িতে পারিবে না।

হাত দুইটা টাটাইতেছে—তবু এই শেষ আশায় নির্ভর করিয়া সে সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া চলিল। কাঁকর যত খুসি বিঁধুক, একটু পরেই তো সেই মূর্ত্তিকে সে ধরিতে পারিবে!

পাহাড়টা বাস্তবিক আকাশের গায়ে আসিয়া ঠেকিল। আর সাগরকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই! সে দেহের শেষ

শক্তিটুকু সঞ্চয় করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে উঠিতে লাগিল। ঐ—ঐ যে! আর একটু! সাগর উন্মাদ আগ্রহে হাত বাড়াইল, কিন্তু হঠাৎ আকাশ খুলিয়া ফাঁক হইয়া গেল, এবং চক্ষের পলকে সেই মূর্ত্তি গ্রাস করিয়া আবার বুজিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অসম্ভব বেগে সে নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একটা অস্ফুট রুদ্ধ আর্ত্তনাদ করিয়া সাগর ধড়্মড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। ঘামে তাহার সারা শরীর ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার হাত ঘুমন্ত মণিমালার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমাইলে মণিমালার নাকের ভিতর দিয়া অদ্ভুত একপ্রকার মৃদু শব্দ হয়।

দুঃস্বপ্ন-পীড়িত সাগরকে কেহ আজ বুকে জড়াইয়া ধরিল না, ছাতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় লইয়া গিয়া অপর্য্যাপ্ত চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিল না, গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইল না।—মণিমালা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

সাগর নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। উষার প্রথম ধূসর আলোয় জানালার কাচ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সাগরের দুঃস্বপ্নের জড়িমা কাটিয়া গেল। আজ আবার তাহার মাকে মনে পড়িতেছে।

২

—এমন আল্‌সেমি করে' সময় কাটাতে ভালো লাগে তোমার ?

সাগর বই থেকে চোখ না তুলিয়া বলিল, বই পড়ার নাম নাম আল্‌সেমি ?

—তোমার পক্ষে। যাদের ঢের কাজকর্ম্ম, তাদের কথা আলাদা—কিন্তু তুমি যে দিন-ভর নভেল্ আর চুরুটের টিন্ নিয়ে এই ইজি-চেয়ারে পড়ে' থাকো—সত্যি, ভালো লাগে তোমার ?

একটা পোড়া দেশ্‌লাইয়ের কাঠি পেইজ্-মার্ক্ হিসাবে পাতার ফাঁকে গুঁজিয়া সাগর বইখানা মুড়িল। গান্ধীজীর ভাষার অনুকরণ করিয়া মনে-মনে বলিল, মেরেডিথ্ অপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মণিমালা পারে না। তারপর কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া বলিল, ভালো-লাগা না-লাগার কথাই ওঠে না, কেননা আপাতত—

মণিমালার মসৃণ কণ্ঠস্বর কথাটাকে মাঝখানে কাটিয়া দিল—আর-কোনো কাজ হাতে নেই—এই তো ? কিন্তু নেই কেন ? ইচ্ছে থাক্‌লে কি জুটিয়ে নে'য়া যায় না ? স্ত্রীর আঁচল-ধরা হ'য়ে এখানে পড়ে' না থাক্‌লেই কি নয় ?

কিছুকাল পূর্ব্বে হইলে সাগর এ-কথায় আহত হইত—কেননা, স্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিবার জন্যই সাগর এখানে বসবাস করিতেছে, এ-কথা অভ্রান্ত সত্য নয়। কিন্তু এই চার মাস নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখোপভোগের ফলে সে মণিমালার—তথা, সমস্ত স্ত্রীজাতির—এমন একটা দিকের পরিচয় পাইয়াছে, ব্যাচেলার্-অবস্থায় যাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং আহত-টাহত হইয়া

লাভ নাই। ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারো তো দাও, নচেৎ মূর্ত্তিমান্ পত্নী-প্রেম সাজিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করো। সাগর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় যেন ওয়েদার্-সম্বন্ধে কথা কহিতেছে, এম্নি সাধারণভাবে মণিমালা বলিয়া ফেলিল, কদ্দিন আর বাপের অন্ন ধ্বংস কর্বে?

সাগর একগাল হাসিয়া বলিল, যদ্দিন না অন্ন-কর্ত্তার তিরোধান ঘটে—কারণ তারপর সে-অন্নের মালিক হ'ব আমি। তখন আর শ্রীমতী মণিমালা তাঁর অকর্ম্মণ্য স্বামীকে করুণা করার আনন্দ লাভ কর্তে পার্বেন না—ভারি দুঃখের কথা, কি বলো?

মণিমালা অবিচল গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, আমি বুঝি তা-ই বল্লাম! যার যেমন মন, তেম্নি তো বুঝ্বে! আচ্ছা, তুমিই বলো, পুরুষ-মানুষের দিন-রাত আল্সেমি কি দেখ্তেই ভালো, না কর্তেই ভালো?

—প্রশ্ন গুরুতর। কিন্তু খালি পুরুষমানুষ কেন? মেয়েদের পক্ষে আল্সেমিটা বুঝি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের সর্ব্বানুমোদিত উপায়?

মণিমালা ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আহা—আমি বুঝি—

—ও, না! ভুলে'ই গেছ্লাম। ভুলে'ই গেছ্লাম যে দুপুরে সেলাই-করা ও বিকেলে ফুলের গাছে জল-দে'য়া নভেল্-পড়ার চাইতে শতগুণে ক্লেশকর। আমারই বুঝি হাতে কোনো কাজ নেই? কিন্তু নেই-ই বা কেন? প্রথমত, তোমার সঙ্গে পরম-প্রীতিকর বিশ্রম্ভালাপ—তারপর কবিতা-লেখা—না, বাধা দিয়ো না, আমাকে বল্তে দাও—এই দুটি কাজ করে' নভেল্-পড়ার সময়ই পাই নে। প্রথমটায় তোমার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই? ওটা বাদ

দিলে তোমারো সময়-কাটানো একটা জটিল সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌বে। দ্বিতীয়টার বিরুদ্ধেই তোমার অভিযোগ। তুমি ন্যায়ত আমার কাব্যচর্চ্চা সম্বন্ধে বল্‌তে পারো, 'মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম, মিলিবে কি তাহে হস্তী-অশ্ব, না মিলে শস্যকণা';—কিন্তু হস্তী-অশ্বের প্রতি তোমার লোভ আছে বলে' মনে হয় না—এবং তোমার মুখেই এই একটু আগে যে-খবর পেলাম, তা'তে শস্যকণার জন্য ভেবে মর্‌বার কোনো প্রয়োজন দেখি নে। সম্প্রতি দু'জনে মিলে বাপের অন্ন ধ্বংস করি তো;—সে-অন্ন নেহাৎই যদি কখনো না জোটে, ধীরে-সুস্থে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাবে।

কথা শুনিয়া যে ভড়্‌কাইয়া যায়, সে মণিমালা নয়! সম্মুখের দেওয়ালের উপর অবস্থিত একটা টিক্‌টিকির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, ছেলেবেলা থেকেই শুনে' আস্‌ছি, পুরুষের পক্ষে আত্মসম্মানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

—আমাকে দেখে সে-ধারণা ঘুচ্‌লো বুঝি? কিন্তু এ আর আশ্চর্য্য কি, মণি? আমিও তো শিশুকাল অবধি জেনে আস্‌ছিলাম যে স্ত্রী হচ্ছে নিয়তসেবাপরায়ণা পতিব্রতা কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী—

—কী সর্ব্বনাশ। তবু ভাগ্যিস্‌ আমাকে ভ্যেলোর প্যাডে বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা দুইখণ্ড 'গৃহলক্ষ্মী' উপহার দাও নি!

এই উত্তরে সাগর এতদূর খুসি হইল যে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত তিক্ততা কাটিয়া গিয়া একটি সুস্নিগ্ধ স্নেহমাধুর্য্যে তাহার অন্তর সরস হইয়া উঠিল। মণিমালা অদূরে একটা চেয়ারে

বসিয়া ছিল, সাগর হাসিতে হাসিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই মণিমালা সজোরে তাহার হাত দুইটি ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার ধাক্কা খাইয়া হাল্‌কা চেয়ারটি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল।

সাগর বিমূঢ় হইয়া প্রশ্ন করিল, মানে?

—এর মানেই যদি বুঝ্‌তে, তা হ'লে আর অমন দাঁত বার করে' হাস্‌তে পার্‌তে না।

বলিতে বলিতে মণিমালা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া সাগরের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আচ্ছা, আমাকে অমন কাটা-কাটা কথা বলে' কী সুখটা পাও তুমি?

ভালোবাসিবার ইচ্ছা একবার প্রতিরুদ্ধ হইলে ভালোবাসা সরিয়া গিয়া যে-জিনিষটি আসিয়া সেই শূন্য আসন দখল করিয়া বসে, সাগরের মন তখন তাহার স্বাদ চাখিতেছে। বিরস বিরক্তির মধ্য দিয়া যে-অপরিচ্ছন্ন স্রোত বহিতে সুরু করিয়াছিল, লঘু পরিহাসের ফিল্‌টারে ধুইয়া-ধুইয়া নিজের অজ্ঞাতেই সে তাহাকে স্বচ্ছ পানযোগ্য জলে পরিণত করিয়া আনিয়াছিল—এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার উপর এক ঝুড়ি জঞ্জাল ফেলিয়া দিয়াই যেন মণিমালা আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া গেল। লেখনী নাকি তরবারির চেয়েও শক্তিশালী কিন্তু—সাগর ভাবিতে লাগিল—মণিমালার রসনার

ধার যাহারা জানিয়াছে, পৃথিবীর তীব্রতম কলমের খোঁচাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে।

কিন্তু মণিমালা ইচ্ছা করিয়া যে-নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া গিয়াছিল, তাহা সে বরঞ্চ সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু এই যাচিয়া-ভাব-করিতে-আসার অসম্ভব মেয়েলিপণার বিরুদ্ধে তাহার অন্তরাত্মা তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। মণিমালার দুঃসাহসিক ঔদ্ধত্য দূর থেকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার মত; কিন্তু তাহার আবার হঠাৎ পতিপ্রাণা স্ত্রীর পার্ট্ করিবার সখ চাপিল কেন?

সাগর কেমন-এক-রকম করিয়া বলিল ভবিষ্যতে আর বল্‌বো না। যা বলেছি, তা'র জন্যে পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো।

মণিমালা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, আমি কি তোমার গুরুঠাকুর নাকি যে আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌বো? ক্ষমা ভিক্ষে কর্‌বার আর লোক পাও নি তুমি? পত্রলেখাদের মত আমার ক্ষমা করো' অভ্যেস নেই।

ভালো বিপদেই পড়া গিয়াছে। ইহার কাছে নরম হইলেও মুস্কিল, কঠোর হইলে তো কথাই নাই। সাগর বুঝিল, মণিমালার মনটা এখন এমন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, যেখানে তুচ্ছতম কথাটিও সহিবে না—সাগর যা-কিছু বলিতে যাউক্, ফল দাঁড়াইবে উল্টা। তাই মণিমালাকে হাতের অল্প একটু ঠেলা দিয়া সে বলিল, এখন আমাদের কথা-বার্ত্তা একটুও এগোবে না—তুমি বরঞ্চ স্নান কর্‌তে যাও।

—আমি এলেই তোমার অস্বস্তি লাগে নাকি? যাও-যাও

ছাড়া যে কথাই নেই মুখে! তোমার মত লোকের বিয়ে করাই উচিত হয় নি।

নাঃ, মণিমালা একেবারে ভাল্‌গারের কোঠায় আসিয়া ঠেকিতেছে। অথচ, সাধারণ ভাষায় সে 'শিক্ষিতা'। সাগর জল্পনা করিতে লাগিল, শিক্ষা জিনিষটা মেয়েদের পোষাকের মত; বাহিরে পরিয়া দেখাইয়া বেড়াইবার জন্য; শিক্ষা কখনও তাহাদের রক্তে প্রবেশ করে না। এই জন্য নারী-চরিত্র প্রায় সর্ব্বত্রই এক। বি-এ পাশ মহিলা অনায়াসে নিরক্ষরা গ্রাম্যবধূর সঙ্গে মিশিতে পারে, কিন্তু কোনো ভদ্রলোকই তাহার ভৃত্যের সঙ্গে বন্ধুতা-স্থাপন করিতে পারে না। পাশ-এর পোষাকটা ফেলিয়া দিলেই ভিতরের যে-রক্তমাংস ফুটিয়া উঠে, বর্ণজ্ঞানহীনা কলহপ্রিয়ার সঙ্গে তাহার কোনো প্রভেদই নাই। কে জানে—কন্দর্পবাবুকেও হয় তো শয়নকক্ষে এম্‌নি সব খিটিমিটি সহিতে হয়!

—কি, চুপ করে' আছ যে বড়? কী ভাব্‌ছ? আমাদের সমাজে ডিভোর্স নেই কেন? তা হ'লে এই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে পার্‌তে?

এই প্রশ্নের উত্তরটা সাগরের ঠোঁটের আগায় আসিয়া নড়িতে লাগিল, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সে ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল।

—অভিমান? তবু ভালো! বলি, রাত্তির-অবধি থাক্‌বে তো?

এই রসিকতার রস-গ্রহণ করা দূরে থাক, কথাটা শুনিয়া সাগরের মন এতদূর বিস্বাদ হইয়া গেল যে সে ভালো করিয়া

মণিমালার মুখের দিকে তাকাইতেও পারিল না। কিন্তু কথাটা মণিমালার অন্তর্জগতের অনেক তথ্য তাহার কাছে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া গেল। সাগরের সন্দেহ হইল, স্বামীত্বের প্রতি যে-সব কর্ত্তব্য আরোপিত হইয়া থাকে, সেগুলি অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন করিতে তাহার বোধ করি বা ত্রুটি হইয়া থাকিবে, তাই মণিমালা তাহার সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত নয়; এবং সেই জন্যই অকারণে অজস্র আঘাত দিয়া স্ত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্যটুকু সে বজায় রাখিয়া চলিতে চায়। তাহার যে রূপ আছে, এ-কথা মণিমালা নিজে ভালো করিয়াই জানে; তাই আচরণে বৈপরীত্য দেখাইতে সে আদৌ ভয় পায় না। শেষ পর্য্যন্ত সাগরকে যে তাহারই শয্যার একপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, এই সত্যটাকে সে রঙের টেক্কার মত ব্যবহার করে। সাগরের মনে হইল, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য মণিমালা তাহার চারিদিকে লীলা-চঞ্চল রূপের জাল বুনিয়া চলিয়াছে; সাগর নড়া-চড়া করিবার সামান্যতম লক্ষণ দেখাইলেও তাহার উদ্বেগের আর সীমা-পরিসীমা নাই। অবস্থাটা মনে-মনে কল্পনা করিয়া সাগর স্বীয় স্বামীত্ব-গৌরবে মোটেই প্রীত হইতে পারিল না। সে মণিমালার স্বামী, তাহার এই পরিচয় সংসার-সমাজের দিক থেকে যত বড়ই হউক, ইহার চেয়েও বড় ও সত্যকারের পরিচয় তাহার আছে, এ-কথা সে কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

মণিমালা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়; আবার বলিল, তুমি দেখ্‌ছি স্বয়ং ব্রহ্মার চেয়েও গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লে। অথচ সকালবেলা বন্ধুদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে' হাসির শব্দে ঘর-বাড়ি

যে ভেঙে ফেল্‌ছিলে! আমি কাছে থাক্‌লেই তোমার মুখের হাসি শুকিয়ে যায় বুঝি?

—শেল্‌ফ থেকে জেরোমের বইখানা নিয়ে এসো; দু'জনে মিলে' পড়ে' প্রচুর হাসা যাবে।

—তুমি কি সব সময়েই ঠাট্টা কর্‌বে? গম্ভীর হ'তে কি ক্ষণেকের জন্যও পারো না? বলিয়া মণিমালা হতভম্ব সাগরকে নারী-চরিত্র-জল্পনায় নিয়োজিত রাখিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

সেই বিকালে সাগর বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় মণিমালা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাচ্ছ?

সাধারণত সাগর কোথাও বড় একটা বাহির হয় না; সুতরাং আজ সে কোথায় যাইতেছে, এ-বিষয়ে লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষত সে-লোকটি যদি তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়। তবু সাগরের এ-প্রশ্ন ভালো লাগিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মণিমালা আবার বলিল—জামাই সেজে কোথায় বেরুনো হচ্ছে, শুনতে পাই নে?

সাগর বিশেষ কিছু না ভাবিয়া জবাব দিল—বায়োস্কোপে।

মণিমালার সমস্ত শরীর হাসিতে ভাসিয়া গেল।—বায়োস্কোপে? আমাকে নিয়ে চলো না সঙ্গে!

সাগর তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, আজ আমার দু'একজন বন্ধু আস্‌বেন—তাঁদেরকে কথা দিয়েছি; তোমাকে নিয়ে বরঞ্চ আর একদিন—

একটু ভাবিয়া আবার বলিল, আজ্‌কে না-হয় একটা বক্স্ ঠিক করে' আস্‌বো।

কিন্তু এ-কথা বলিবার কোনো দরকার ছিল না। মণিমালার মেজাজ এ-বেলা ভালো ছিল; হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা—থাক্, থাক্—আর ভালোমানুষগিরি ফলাতে হ'বে না। তবু ভাগ্যিস্ আজ একটু বেরুবার নাম কর্‌লে; আমার ভয় হচ্ছিল—বারান্দার ঐ ইজি চেয়ারটায় তুমি শিকড় গজাবে—

—প্রায় গজাচ্ছিলাম, সম্প্রতি উপ্‌ড়ে ফেল্‌বার চেষ্টায় আছি।

—সত্যি নাকি? মণিমালা—যেন নিজেরই অজ্ঞাতে সাগরের

একেবারে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সাগর একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলেই মণিমালার কানের কাছে চুলগুলি উড়িয়া উঠে।

সাগর সরিয়া গিয়া টিন্ হইতে সিগারেট লইতে-লইতে বলিল ---অনাবশ্যক জানিয়াও বলিল, আমার দেরি হ'লে তুমি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে থেকো।

নিরুদ্দেশ ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সাগর বায়স্কোপের কাছে আসিয়া পড়িল। পা দুইটাকে একটু জিরাইয়া লইবার জন্য—এবং মণিমালার কাছে স্রেফ্ মিথ্যা বলিবার পাপ হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্যও বটে—সে একটা টিকিট্ কাটিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পালা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মিনিট্ কয়েক অবিশ্রান্ত চুম্বন ও অলিঙ্গন দেখিয়া—এবং ঐ ঠাসা ঘরের বদ্ধ বাতাসে—তাহার শ্বাস-রোধ হইয়া আসিল। বাহির হইয়া সে বাঁচিল।

যেমন করিয়াই হোক্, বাড়ি ফিরিতে দেরি করিতে হইবে নহিলে মণিমালার কাছে সম্মান থাকিবে না। নদীর পারে পেনসন্-পাওয়া বুড়ো এবং পিরাম্বুলেটারের শিশুরা ছাড়া আর কাহারো যাওয়া উচিত নয়; তবু গত্যন্তর-অভাবে সে সেই দিকেই পা চালাইল।

সময়টা যাহাকে বলে বসন্তকাল। শহরে ঢুকিবার পথ না পাইয়া নদীর পারে অনেকগুলি বাতাস ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই বাতাসগুলির লোভে-লোভে বহু লোক সেখানে চলাফেরা করিতেছে ;—সাগর তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গেল।

নদীর পারে সে কদাচিৎ আসিয়াছে, কিন্তু জায়গাটি তাহার মন্দ লাগিল না। রাতটা অন্ধকার—নদীর জল কালো হইতে-

হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেছে; এখানে-ওখানে নৌকার আলোগুলি জলের নীচে বহু দূর পর্য্যন্ত লাল সাপের মত আঁকা-বাঁকা ছায়া পাঠাইয়া দিয়া যদি না জ্বলিত, তাহা হইলে উহাকে নদী বলিয়া চেনা যাইত কিনা সন্দেহ। আকাশটা শানানো ইস্পাতের মত ধারালো, ঝক্‌ঝকে—সাগরকে খুসি করিবার জন্যই আজ যেন সেখানে এক ঝাঁক নূতন তারা দেখা দিয়াছে।

আজ সারাদিন সাগরের মন গুমোট্‌ বাঁধিয়া ছিল;—বার দুই বড়-বড় পা ফেলিয়া নদীর পারটি আগাগোড়া টহল দিয়া তাহার মনের এমন একটি অবস্থা হইল, যাহা সে বহুকাল অনুভব করে নাই। শারীরিক পরিশ্রমে তাহার মুখে স্বাস্থ্যের উত্তপ্ত দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার হাতের মসৃণ চামড়ার নীচে ছোট-ছোট শিরাগুলিতে টাট্‌কা রক্ত অবিশ্রান্ত যাওয়া-আসা করিতেছে—তাহার চলার সুর সাগর যেন শুনিতে পাইল। সহসা সাগরের মনে হইল, সুস্থ ও সম্পূর্ণ দেহের মত এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য শা-জাহানের তাজ-মহলও নয়! অথচ, তাজ-মহল দেখিয়া কত কবিরই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু মনুষ্য-দেহকে কোনো কবিই উপযুক্ত অভিনন্দন জানায় নাই, নবাবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম কবি ছাড়া। সেই কবির কাব্য আজ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে; কেন মানুষ দেবতার কাছে সুখ চায়, শান্তি চায়, সম্পদ চায়? দেবতা তো এক সঙ্গেই সমস্ত দান করিয়াছেন—সে-দানে কোনো কার্পণ্য করেন নাই—শরীর-নির্ম্মাণে কোনো

ত্রুটি তাঁহার হয় নাই। ইংরেজদের রেস্‌পেক্‌টেব্‌লিটি বাঙ্‌লা-দেশকে পাইয়া বসিয়াছে—অপরিসর জীবনের নির্দ্দোষ ভদ্রতায় আমরা মরিতে বসিয়াছি। সাগরের চোখে আমেরিকা এল্‌-ডোরাডোর মতো জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মলতায় উদ্ভাসিত হইল ;—প্রকাণ্ড প্রান্তরের উপর প্রকাণ্ড সমুদ্র আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে—সেই দীর্ঘ ঘাসের উপর উবু হইয়া সে সূর্য্যের দিকে পিঠ উদ্‌লা করিয়া দিয়া শুইয়া থাকিতে চায়—রাত্রিতে চিৎ হইয়া তারাগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবে। রোদ লাগিয়া-লাগিয়া তাহার গায়ের চাম্‌ড়া ঝুনো হইবে, গায়ের রক্ত গাঢ় হইবে—মদের মতো তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল হইবে।

নদীর কালো জলের দিকে চাহিয়া সাগর ভাবিল, তাহার এই আত্ম-সচেতন জীবনের উন্মুক্ত উদারতাকে কেহই বুঝি রোধ করিতে পারিবে না—মণিমালাও না। তাহার যে-ভবিষ্যৎ আকাশের মতো বিশাল, সূর্য্যালোকের মতো অজস্র হইয়া দেখা দিয়াছে, মণিমালা সেখানে একটি রঙীন পতঙ্গের মতো, একটি পাখীর পালকের মতো উড়িতেছে মাত্র। অথচ, আজই সকালে মণিমালাকে সে কতটা প্রাধান্য দিয়াছিল, সে কথা মনে করিয়া তাহার যেন বিশ্বাসই হইতে চাহিল না।

নদীর দিকে তাকাইয়া চলিতে-চলিতে বিপরীতগামী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার ঠোকাঠুকি লাগিয়া গেল। 'সরি—'. ভদ্রলোক নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া ডাকিল—সাগরবাবু ?

সাগরও থামিল। গলার আওয়াজটা তাহার কাছে অত্যন্ত

পরিচিত মনে হইল, কিন্তু কবে—কোথায় সে ঐ আওয়াজ শুনিয়াছিল, তাহা চট্ করিয়া মনে করিতে পারিল না। কিন্তু ভদ্রলোক কাছে আসিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে, বিনোদ বাবু যে?

হ্যাঁ, বিনোদ বই কি। ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর নীচে থামটার মতই স্পষ্ট ও নিশ্চিত বিনোদ দাঁড়াইয়া—সেই বিনোদ। তফাতের মধ্যে তাহার জামা-কাপড়ে বিশেষ একটু পরিচ্ছন্নতা আসিয়াছে, বাঁ হাতে একটা কালো পাথরের আঙটিও সাগরের চোখ এড়াইল না।

এই মুহূর্ত্তে সাগর যে সব কথা ভাবিতেছিল, তাহার দশলক্ষ মাইলের মধ্যেও বিনোদ ছিল না; হঠাৎ যেন সে এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। চট্ করিয়া নিজকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, আপনি এখানে? কবে এলেন?

বিনোদ বলিল, আমি কাল এসেছি। আপনি সেই থেকে এখানেই আছেন, তা হ'লে?

—হ্যাঁ—যাবো আর কোন্ চুলোয়? বেশ লোক কিন্তু আপনি—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যান্ নি যে?

বিনোদ ইহার পূর্ব্বেও বার-কয়েক ঢাকায় আসিয়াছিল, কিন্তু যে-লজ্জায় সে সাগরের সঙ্গে দেখা করিতে যায় নাই, তাহারই ইংরাজি নাম অ্যাড্‌মিরেশ্‌ন্। সত্যটা গোপন করিয়া গিয়া সে বলিল, আপনার ঠিকানা জান্‌তাম না।

—কেন? সত্যবানের কাছ থেকে—হঠাৎ সাগরের মনে হইল, এ-কথা ভাবিবার অধিকার তাহাকে কে দিয়াছে যে

বিনোদ ঢাকায় আসিয়াছে বলিয়াই তাহার সঙ্গে দেখা করিবে, এবং সেইজন্য চেষ্টা করিয়া তাহার ঠিকানা জোগাড় করিবে? তা ছাড়া, সময়ের চাকার বাড়ি খাইয়া কে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বা ঠিক-ঠিকানা কী? মনে মনে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, যাক্—আমার কপাল ভালো; তাই আজ নদীর পারে এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

সাগরের ঠিকানা বিনোদ খুবই জানিত; কিন্তু সাগর আগেকার দিনে তাহার সঙ্গে এমন একটি দূরত্ব রাখিয়া চলিত যে সত্য বলিতে কি, সাগরের কাছে যাইতে তাহার সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই। তাই আজ সাগরকে তাহার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ব্যবহার করিতে দেখিয়া সে একদিকে যেমন আশ্চর্য্য ও খুসি হইল, অন্যদিকে পূর্ব্বেকার ভীরুতার জন্য নিজকে তেমনি ধিক্কার দিতে লাগিল—আবার, সাগরের অকপট অভ্যার্থনাকে মিথ্যাচরণ দিয়া অপমান করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সে আর কোনো কথা না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল —কেমন আছেন?

—বেশ। খাবার পর্‌বার চিন্তে নেই। আপনি কি কর্‌ছেন এখন?

—একটা লাইফ্‌ ইন্‌শিয়োরেন্সের এজেন্সি নিয়েছি, কোনো-মতে ভাত-কাপড়ের খর্‌চাটা উঠ্‌ছে। সেই উপলক্ষ্যেই ঢাকায় আসা।

ও, সাগর এতক্ষণে গরদের পাঞ্জাবী ও পাথরের আঙ্‌টির

মানে বুঝিল। ভাত-কাপড় কথাটা এখানে রূপক-হিসাবে নিতে হইবে।

—চলুন্ একটু চা-খাওয়া যাক্। কাছেই একটা কন্‌-ফেক্শ্‌নারি আছে।

৪

চা খাইতে-খাইতে বহু প্রশ্নোত্তর-বিনিময় হইল। বিনোদ সত্যবানের কোনো খবরই দিতে পারিল না—বহুকাল তাহার সঙ্গে দেখা নাই; তবে সে কলিকাতাতেই আছে, এই প্রকার একটা জনরব তাহার শ্রুতি-গোচর হইয়াছে। মিহির, ভোম্বল ইত্যাদি দলের আর সবাই কে যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কাহারো কোনো পাত্তা পাওয়ার উপায় নাই। অথচ, তখন মনে হইয়াছিল, হস্‌টেল্ এর সাতাশ নম্বরের ঘরটির আড্ডা কোনো-কালেই ভাঙিবে না। সময় এম্‌নি জিনিষ—

বিনোদ দার্শনিকতার দিকে ঝুঁকিতেছিল, সাগর বাধা দিয়া বলিল, ছুটো ডিম নে'য়া যাক্—কি বলেন?

কোমরে গামছা-জড়ানো নগ্নদেহ এক ছোক্‌রা টেবিলের উপর ছুইটা ডিম রাখিয়া যাওয়ার পর বিনোদ চাম্‌চে দিয়া চায়ের বাটিতে মৃদু টোকা মারিতে-মারিতে মৃদুতর কণ্ঠে এক নূতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল—পত্রলেখার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

সাগর এ-জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল; ডিমের গায়ে মশ্‌লা ছড়াইতে-ছড়াইতে বলিল, জানি।

বিনোদ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, আপনি সইতে পার্‌লেন?

সাগর বুঝিল, মূলত বিনোদ একই রহিয়া গিয়াছে। পাছে সে পরের মুহূর্ত্তেই একটা কবিতার লাইন্ আওড়ায়, সেই ভয়ে সে—কিন্তু সে মুখ না খুলিতেই বিনোদ বলিল, হ্যাঁ, আমি সব জানি। এত বড় নিষ্ঠুর ছলনা পৃথিবীতে আর হ'তে পারে না, কিন্তু তবু—

—মাস ছয়েক হ'ল আমি বিয়ে করেছি।—আর দু' পেয়ালা চা নে'য়া যাক্।

বিনোদের দেবতা উঁচু আকাশ হইতে ধুপ্ করিয়া শক্ত মাটির উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। তাহার প্রচণ্ড শব্দে বিনোদের মুখ পাংশু হইয়া গেল।

—সত্যি? কেন এ-ভাবে নিজের জীবনের সর্ব্বনাশ কর্‌লেন?

—সর্ব্বনাশ কেন? মেয়েটি বেশ। মণিমালাকে আপনারও খারাপ লাগ্‌বে না।

বিনোদ বোধ হয় সাগরের কথাগুলি শুনিতেই পায় নাই। হঠাৎ বলিল, এই জন্যই আজকাল আপনি কিছু লিখ্‌ছেন না!

—লিখ্‌ছি ঢের। তবে সেগুলো মুখ-দেখাবার মত হচ্ছে না।

বিনোদ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল, সাগর বাবু—আমাদের দেশের একটা সেকেলে কথা আছে—কবিত্ব সুদুর্লভ। আপনি অমর হ'য়ে আসেন নি;—যেটুকু সময় হাতে আছে, তা'র অপচয় কর্‌লে ঈশ্বর সে-অন্যায় সইবেন না।

সাগর হাসিয়া বলিল, অপচয় তো কর্‌ছি নে। যে-দুর্লভ ক্ষমতার কথা বল্‌ছেন, তা'কে কেউ আট্‌কাতে পারে বলে' বিশ্বেস করেন?

বিনোদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নিশ্চয়ই করি। বিবাহিত জীবনের সঙ্কীর্ণতা—

—এমন কোনো বড় কবির কথা জানেন যে তিরিশ বছর বেঁচে ছিলো, অথচ বিয়ে করে নি? এমন কি মিল্‌টন্‌ও—

—মিল্‌টন্‌-এর সইতো—আপনার সইবে না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি সাগরবাবু, বিয়েটা আপনার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে মারাত্মক হচ্ছে।

অতিরিক্ত আরামে বহুকাল কাটানোর ফলে সাগরের মনোবৃত্তি এমন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল যে তর্কের সম্ভাবনা দেখিলেই সে গায়ে পড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া অন্যের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। তাই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট মুখে নিয়া কহিল, হয়-তো তা-ই কিম্বা হয়-তো সেই সুদুর্লভ-জন্মই আমার নয়। কিন্তু যা করে' ফেলেছি, তা করে' ফেলেছি।

বিনোদ কোনো কথার জবাব না দিয়া ম্যানেজারের টেবিলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত হ'ল এখানে?

সাগর তীব্র আপত্তি করিল—ও কি? আপনি দিচ্ছেন কেন? এই যে আমি—

বলিয়া পকেটে হাত দিল। কিন্তু বিনোদ তখন খুচ্‌রো হাতে লইয়া গুনিতেছে।

সাগর বাহিরে আসিয়া বলিল, ছি-ছি, কী অন্যায় কর্‌লেন, বিনোদবাবু—আমিই আপনাকে দোকানে নিয়ে এলাম!

বিনোদ শান্তস্বরে শুধু কহিল—তা আর কি হয়েছে।

বিনোদের সঙ্গে এই আলাপ সাগরকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে উত্তেজিত করিয়া দিয়া গেল। বিনোদের মনের আয়নায় সে নিজের যে-চেহারা দেখিতে পাইল তাহা কবির মূর্ত্তি। তখ

সে-মূর্ত্তিকে সে মুখ ভ্যাঙ্চাইয়াছে, কিন্তু ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফিরিতে-ফিরিতে বিনোদের শ্রদ্ধার পাত্রটি তাহাকে থাকিয়া-থাকিয়া হানা দিতে লাগিল। তাহার অলস মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাহিত্যিক গৌরবাকাঙ্ক্ষা খোরাকের অভাবে নিবু-নিবু হইয়া আসিতেছিল, বিনোদ তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেছে। তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল যে কবি হইবার জন্যই তাহার জন্ম হইয়াছিল—এককালে তো সে সমস্ত প্রাণ দিয়াই কবিতা লিখিত। তখন পর্য্যন্ত তাহার হাত পাকে নাই, কিন্তু—সে জানে—সত্যিকারের আগুন তাহাতে ছিল ;—আজ-কাল সে কলের মত যে-সব নিখুঁত জিনিষ উৎপাদন করিতেছে, সেগুলি পড়িলে সমালোচকেরা বাহবা দিবে, কিন্তু সে তো জানে ও-গুলি নেহাৎই বাজারের জিনিষ!

সে তো সবই জানে, তবু সে কেন এমন নিশ্চেষ্ট, অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছে? মণিমালা ঠিকই বলিয়াছিল, সে এখানে স্ত্রীর আঁচল ধরিয়াই পড়িয়া আছে! বিনোদ ঠিকই বলিয়াছে, সে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ চিবাইয়া খাইতেছে। প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল—হয়-তো তাহার অবশিষ্ট আয়ুর তিরিশ ভাগের এক ভাগ—হয়-তো আরো বেশি! এই এক বৎসর সে যে শুধু নিশ্চল হইয়া আছে তাহা নয়—রীতিমত পিছাইয়া গিয়াছে—এই ক্ষতিটুকু পূরণ করিতেই বোধ হয় আরো দুই বৎসর যাইবে!

সাগর অস্থির হইয়া উঠিল। সবেগে একবার মাথা ঝাঁকিয়া ন্য একটা আগন্তুক দুশ্চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া দিল। এখনো—

এখনো বোধ হয় সময় আছে! আরো কিছুদিন কাটিলে দোতলার বারান্দার ইজি-চেয়ারটা তাহার চিতায় পরিণত হইত। উন্মত্ত আগ্রহে সে ভাবিতে লাগিল, সারাদিন বাসাহারের জন্য বিশ্রী পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে—বা মাসান্তে—একটি ভালো কবিতা লিখিয়া যে জীবন কাটায়, তাহার অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে সে কি চিরকালই বঞ্চিত থাকিবে? আয়ুর রেখা কোথায় আসিয়া বাস্তবিক ঠেকিয়াছে, তাহা করতল দেখিয়া বোঝার উপায় নাই, কিন্তু সে যদি কালও হয়, তথাপি এই মুহূর্ত্ত হইতে একটি মুহূর্ত্তও সে আর হারাইবে না। সমুদ্রের মুখে মুখ রাখিয়া নূতন আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘুমাক্, লৌহময় কর্কশ চীৎকারে কলিকাতা তাহাকে ডাকিতেছে—সে ডাক উপেক্ষা করা অসাধ্য।

রাস্তা হইতে সাগর দেখিল, তাহার শুইবার ঘরটি অন্ধকার। মণিমালা পতি-আজ্ঞা পালন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নীচের সিঁড়িতে গামছা পাতিয়া ঠাকুরটা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাগরের একটুও ক্ষুধা-বোধ ছিল না, তবু ঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুসারে সে পেটের মধ্যে কতগুলি খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া উঠিয়া আসিল।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, একটু ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। সাগর আলো জ্বালাইয়া দিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সিগারেট্ ধরাইল।

চোখে আলো লাগাতেই বোধ হয়—মণিমালার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে মশারি তুলিয়া শুধু মুখখানা বাহির করিয়া ভাঙা-ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসেছো?

সাগর মুখ ফিরাইয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘুমাইয়া উঠিলে মানুষের মুখ এমন সুন্দর হয় নাকি? কই, সে তো আর কখনো তাহা লক্ষ্য করে নাই! বালিশের উপর মণিমালার মুখ ফুলের মতো ফুটিয়া রহিয়াছে—ছায়াপথের মত পরিচ্ছন্ন, ঈষৎ মোহময়। তাহার চোখের কালো আলোগুলিতে সাগর অন্ধ হইয়া গেল;—আর তাহার চুল—কী চুল! কেন মণিমালা কুৎসিত হইল না?

—খেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—শোবে না? রাত ক'টা হ'ল?

—এগারোটা মাত্র।

—শোবে না এখন?

—হুঁ। সিগারেট্টা শেষ হোক্।

শেষ হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সাগরকে আর-একটা জ্বালাইতে দেখিয়া মণিমালা উষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিজের না-হয় ঘুম-টুম পায় না;—তাই বলে' অন্য লোককেও ঘুমুতে দেবে না নাকি?

সাগর আলোটা নিবাইয়া দিয়া কহিল, তুমি ঘুমোও মণি, আমার একটু দেরি আছে।

সঙ্গে-সঙ্গে মণিমালার মুখ মশারির ভিতরে অন্তর্হিত হইল। সাগর সস্নেহ করুণায় ভাবিল—মণি বড় ঘুম-কাতুরে।

কিন্তু একটু পরেই সে আবার শুনিতে পাইল, ওখানে ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী ভাব্ছ তুমি? শোও না এসে।

দাঁড়াইয়া-থাকাটা সত্যিই সুখকর নয়। সাগর মণিমালার

কথামত—ঠিক শুইল না—খাটের একপাশে গিয়া বসিল। বলিল, তোমার কথাই ঠিক, মণি।

ফুলের মতো একখানা মুখ আবার মশারির ভিতর থেকে বাহির হইয়া আসিল।—কোন্ কথা?

—বাস্তবিক, আল্‌সেমি করে'-করে' গেঁজে যাচ্ছি।

—হঠাৎ?

—আমি শিগ্‌গিরই কল্‌কাতায় যাচ্ছি।

আলো থাকিলে সাগর দেখিতে পাইত, ছায়াপথের মতো মোহময় মুখ শ্বেত-পাথরের মতো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মণিমালা নীরব।

একটু ভাবিয়া সাগর একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করিল, আজ হঠাৎ এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। সে এক লাইফ্-ইন্‌শিয়োরেন্স্-এর এজেন্সি নিয়ে ফেঁপে উঠেছে—কল্‌কাতার আপিসের সে-ই কর্ত্তা—আমার জন্যে একটা চাক্‌রি বাগাবে, বলেছে। মাত্র দেড়-শোতে আরম্ভ, তবে লেগে থাক্‌তে পার্‌লে প্রস্পেক্ট্‌স্ আছে ঢের। মন্দ কি? বিংশ-শতাব্দীতে যে-লোক গ্রাজুয়েট্‌ও নয়, সে এর বেশি আর কী আশা কর্‌তে পারে?

তথাপি মণিমালাকে নির্ব্বাক দেখিয়া সাগর আবার বলিল, আমি তাকে এক রকম পাকা কথা দিয়েছি। কাল্‌কেই রওনা হ'তে হ'বে।

মণিমালা তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল—কাল্‌কেই?

—কাল্‌কেই। বলা যায় না, যদি ইতিমধ্যে কেউ কেড়ে নেয়। কী মনে করো তুমি?

—ব্যবস্থা কর্‌বার সময় তো আর আমার মত নাও নি—এখন আর আমাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছ কেন ?

—বা রে, তোমার কথা ভেবেই তো আমি নিলাম এটা। বসে' থেকে-থেকে শরীরও খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে আমার। ভালোই তো হ'ল। একটু থামিয়া—আগাগোড়া ব্যাপারটার রঙ্ চড়াইয়া দিবার জন্য সাগর বলিল, চারদিক একটু গুছিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেই তোমাকেও নিয়ে যাবো।

—তদ্দিন আমি একা এই শূন্যপুরীতে পড়ে' থাকবো ?

—একা কেন ? বাবা তো রয়েছেন ; তিনি তোমার অযত্ন হ'তে দেবেন না।

—আচ্ছা যাও, আমার যত্নের জন্য তোমাকে আর ভেবে মর্‌তে হ'বে না। তুমি চলে' গেলে আমি সুখেই থাক্‌বো।

একটা বিপুল দায়িত্ব খালাস করিয়া সাগর নিশ্চিন্তমনে মশারির মধ্যে ঢুকিল। মণিমালা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কাল্‌কেই যাচ্ছ ?

সাগর একটা হাসিকে বালিশের মধ্যে চাপা দিয়া বলিল—হ্যাঁ।

মণিমালা পাশ ফিরিয়া কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল ; তাহার ইচ্ছা হইল, বলে—আজ্‌কের রাত্তিরটা তা হ'লে না ঘুমোলাম ; ইচ্ছা হইল, বলে—

৫

যতক্ষণ না নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার ছাড়িল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাগর বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না যে সে সত্য-সত্যই কলিকাতায় চলিয়াছে। স্টিমার মোড় ঘুরিল, ব্যোমকেশ ডেক্-এ দাঁড়ানো ছেলের প্রতি শেষ স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জেটির ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল; সাগর একটি গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ক্যাবিনে ঢুকিল। ক্রমশ দূরায়মান নারায়ণগঞ্জ ইষ্টিশানের দিকে তাকাইয়া নিশ্চিন্ত আনন্দের সহিত সে উপলব্ধি করিল যে কলিকাতা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

পরিবারগত জীবনের পারস্পরিক প্রীতি-বন্ধনগুলি তাহার মনের মধ্যে শিথিল হইয়া আসিয়াছে; ব্যোমকেশের প্রকাশহীন, উচ্ছ্বাসহীন স্নেহও তাহার মনের মধ্যে সেই ঈষৎ বিষাদের মোহ সঞ্চারিত করিতে পারিল না, যাহা আই-সি-এস্ যুবকও বিলাত-যাত্রী জাহাজে উঠিবার সময় অনুভব না করিয়া পারে না। সকালবেলা সে যখন তাহার বাবার কাছে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে গেল, ব্যোমকেশ তখন শেইরোর নব-প্রকাশিত গ্রন্থে মগ্ন। সাগরের পায়ের শব্দ শুনিয়াই বলিয়া উঠিল, এদিকে এসো তো একটু।

তারপর তাহার একখানা হাত লইয়া খানিকক্ষণ এপিঠ্ ওপিঠ্ করিয়া:

হুঁ, লম্বা, সরু ছুঁচ্লো আঙুল—ঠিকই মিলেছে। আর্টিস্টিক্ হাত।

বিশেষণটা শুনিয়া সাগর উল্লসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সমস্ত আর্টিস্টদের এই হাত থাকে তো?

—ঠিক উল্টো। বেশির ভাগ আর্টিস্টেরই থাকে না। যাঁরা বাস্তবিক কোনো কাজ করে' যান্, তাঁদের সাধারণত ফ্ল্যাট্ বা সাংসারিক হাত থাকে। আর্টিস্টিক্ হাতের লোকেরা আর্ট্ বোঝে, ভাবেও ঢের, মনটা তাদের বাস্তবিক সূক্ষ্ম হয়, কিন্তু কাজে কিছুই করে' উঠ্তে পারে না—তাই আর্টিস্ট্ নাম উপার্জ্জন করা তাদের ভাগ্যে হ'য়ে ওঠে না।

সাগর হাসিয়া বলিল, হাতের ছাঁচেও বরাত লেখা থাকে, দেখ্ছি। আমার কপালে অবিশ্যি নেই, কিন্তু আমি ঠিক করে' ফেলেছি যে আর্টিস্ট্ হ'ব ;—দেখা যাক্ ঈশ্বরের হাতের উপর হাত চালানো যায় কি না।

কথাটা কোন্দিকে গড়াইবে, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া ব্যোমকেশ বলিল, অবশ্যি সব সময়েই যে এ নিয়ম খাট্বে, তা নয়—

তাই আমি—সাগর বাধা দিল—তাই আমি আজ কল্‌কাতায় যাচ্ছি। এখানে কাজ-কর্ম্মের ভারি অসুবিধে হয়।

শেইরো খালাস পাইলেন ; ব্যোমকেশের চোখ সন্দেহে বেদনায় অস্বস্তিতে নিবিড় হইয়া উঠিল। তাহার কথাটা অভিমানের মত শুনাইল—এখান্কার চাইতে আরাম কোথায় পাবে তুমি ?

—পাবো না বলে'ই তো যাচ্ছি। আরামে আমার মনে মর্‌চে পড়ে' যাচ্ছে। ইজি-চেয়ার থেকে কখনো বড় সাহিত্য বেরিয়েছে ? কাজের ঘষায় আমি সেই মর্‌চে তুলে' ফেল্‌তে চাই, তবে যদি ভাগ্যরেখাকে অতিক্রম কর্‌তে পারি। নইলে

শেইরো-সাহেব যা বলেছেন, আমার বেলাতেও তা-ই হ'বে; আর্টিস্‌ট্ নাম আমার জুট্‌বে না।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া সাগরের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু আজ্‌কেই যাচ্ছ [illegible]

—যাবো বলে' যখন ঠিক কর্‌লাম, তখন আজ্‌কেই নয় কেন? তা ছাড়া, একটা চাকরির চেষ্টা কর্‌বো।

—কী চাক্‌রি?

—একটা মোটা রকমের কেরাণীগিরি; আমার পক্ষে তা-ই ঢের।

—কেউ কোনো আশা দিয়েছে নাকি?

—ঠিক আশা দেয় নি।—বাবার কাছে চট্ করিয়া মিথ্যা কথাটা বলিতে না পারিয়া সাগর আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিল—তবে চেষ্টা কর্‌লে একটা জুটিয়ে নে'য়া যায় আর কি!

—মণিকে বলেছো?

সাগর একটু অতিরঞ্জন না করিয়া পারিল না—হ্যাঁ, ওর গরজেই তো কাজ বাগাতে যাচ্ছি। আজকালকার মেয়েরা স্বাধীন হ'তে চায়।

ব্যোমকেশ গম্ভীরভাবে শুধু বলিল, হু।

সাগর মনে করিল, তাহার উপস্থিতির আর প্রয়োজন নাই। উঠিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, মণিকে নিয়ে যাচ্ছ?

—না। কথাটার উপর খাম্‌কা সে অনেকখানি জোর দিয়া ফেলিল।—এখানে ও বেশ থাক্‌বে।

ব্যাপারটার কোথায় যেন কি গোলমাল আছে, ব্যোমকেশ খুব নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না—বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া সাগরের তাহাই মনে হইল। পাছে ব্যোমকেশ কোনো অসুখকর কথা পাড়িয়া বসে, সেই ভয়ে সাগর তাড়াতাড়ি বলিল, যাই এখন, সব গুছোনো বাকি।

উপরে আসিয়া দেখিল, মণিমালা অসম্ভব মনোযোগের সহিত প্রভাত মুখুয্যের ছোট গল্পের বই পড়িতেছে। সাগরকে যেন দেখিতেই পাইল না। রোজ চাকর আসিয়া চা দিয়া গেলে সাগর মণিমালার ঘুম ভাঙায়, কিন্তু আজ চোখ মেলিয়া সে মণিমালাকে দেখিতে পায় নাই। সাগর এখনি উঠিবে, না পাশ ফিরিয়া আর একটু ঘুমাইবে, তাহা ভাবিতেছিল, এমন সময় মণিমালা নিজে চা লইয়া আসিয়াছিল। মণিমালার চোখের দিকে তাকাইয়া সাগরের মনে হইয়াছিল, সে সারারাত ঘুমায় নাই, কিন্তু তাহার আসন্ন যাত্রার কল্পনায় তাহার মন তখন উপপ্লাবিত, অন্য-কোনো চিন্তাকে বেশিক্ষণ আমল দিতে সে অক্ষম। মণিমালার বিনিদ্র অবস্থা তাহার মনের কিনার একটুখানি ছুঁইয়াই হাল্কা বুদ্বুদের মতো ফাটিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল।

সাগর দারুণ অধ্যবসায়ের সহিত স্যুটকেইস্ গুছাইতে বসিল। আধঘণ্টা-অন্তে শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কোনো-প্রকারে ঠাসা গেল বটে, কিন্তু বাক্সটি কিছুতেই আট্‌কানো যাইতেছে না। গায়ের জোরে মুখটা চাপিয়া আনিয়া ডালাটা আট্‌কাইবার চেষ্টা করিতেই উহা স্প্রিঙ্-এর মতো ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া যায়। সাগর কপালের ঘাম মুছিল।

মণিমালার গল্পটা শেষ হইয়াছিল বুঝি। নিঃশব্দে আসিয়া স্যুটকেইস্ হইতে সমস্ত জিনিষ নির্দ্দয়ভাবে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সাগর শঙ্কিত হইয়া বলিল, এ কী কর্‌লে? এত কষ্ট করে' ভর্‌লাম!

মণিমালা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—কষ্ট হ'ল নষ্ট।

তারপর প্রত্যেকটি জামা-কাপড় আলাদা-আলাদা ভাঁজ ও পাট করিয়া স্যুটকেইসে সাজাইয়া বলিল—আর কিছু আছে?

আর কিছু ছিল না; ডালাটা বাপের সুপুত্রের মত নামিয়া আসিল। চাবি লাগাইয়া মণিমালা আবার বই খুলিয়া বসিল।

একটা কাঠের বাক্সে সাগর তাহার বইগুলি লইল। আর লইল ফাউস্‌ট্‌কে।

ফাউস্‌ট্‌-এর গলায় নূতন বক্‌লস্, তাহাতে ঝক্‌ঝকে চেইন্ বাঁধা। তাহাকে আজ সাবান দিয়া স্নান করানো হইয়াছে, পরে গা বুরুশ করা হইয়াছে পর্য্যন্ত। ফাউস্‌ট্‌ অনুভব করিল, তাহার অদৃষ্টে শীঘ্রই একটা বিপর্য্যয় ঘটিবে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়া সে সেই ঘটনার অপেক্ষা করিতেছে।

সাগর যদি আজ রোজকার মত মণিমালাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে তাহার মধ্যে অনেক আশাতীত গভীরতা আবিষ্কার করিয়া সে বিস্মিত হইতে পারিত। হয়-তো শেষ পর্য্যন্ত সে মন বদ্‌লাইয়া ফেলিত। কিন্তু আজ তাহার সময় নাই—সময় নাই।

'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর।' মানে, প্রায় দ্বিপ্রহর। এগারোটা পঞ্চাশে কলিকাতা মেইল্ ছাড়ে।

মণিমালার হাত হইতে পাণ লইয়া সাগর সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মণিমালা তাহার সাম্‌নে গিয়া নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। মণিমালার চোখের জলের ফোঁটাগুলি সাগরের পায়ের চাম্‌ড়ায় না পড়িয়া জুতার চাম্‌ড়ায় পড়িল। মণিমালা সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়া আসিল না।

ব্যোমকেশ গাড়িতে উঠিয়াই ছিল। সাগর তাহার পাশে বসিয়া ডাকিল—ফাউস্‌ট্‌! ফাউস্‌ট্‌ একলাফে গাড়ির মধ্যে উঠিয়া প্রভুর জুতা চাটিতে লাগিল। গাড়ি চলিতে লাগিল, কিন্তু সাগর তাহার দোতলার জানালার দিকে একটিবারও তাকাইল না। তাহার মন কলিকাতায় উড়িয়া গেছে।

নারায়ণগঞ্জে নামিবার পূর্ব্বে ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল—আপাতত কোনো একটা ভালো হোটেলে গিয়ে উঠো। আর গিয়েই একটা খবর দিয়ো। বলিয়া তাহার হাতে যে-পরিমাণ নোটের তাড়া দিয়াছিল, তাহা গ্র্যাণ্ড্‌ হোটেলে একমাস কাটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। সাগর সেগুলি না গুনিয়া পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে রাখিয়া দিল।

জলের ঝপাঝপ্‌ শব্দের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক পাখার গুঞ্জন মিশিয়া একটি একঘেয়ে, মন্থর শব্দের মোহ বুনিয়া চলিয়াছে—সমস্ত স্টিমারে, নদীর জলে, আকাশের বিস্তৃতিতে দুপুরের অলস নিদ্রালুতা। সাগর হুইলার্‌-এর স্টল্‌ থেকে একখানা এড্‌গার্‌ ওয়ালেস্‌ কিনিয়াছিল; ঐ লেখকের উপন্যাসে একবার প্রবেশ করিলে তাহা নাকি কচ্ছপের মত কাম্‌ড়াইয়া ধরে—শেষ না করা পর্য্যন্ত আর মুক্তি দেয় না। সাগর কিন্তু দেড়

পৃষ্ঠার বেশি পড়িতে পারে নাই; বইখানা তাহার কোলের উপর পড়িয়া আছে; তাহার মনের উপর ধীরে-ধীরে একটি মধুর আবেশ নামিয়া আসিতেছে—তাহাকে বাধা দিতে সে চায় না। এমন উত্তেজনা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই। না, ঠিক উত্তেজনা নয়;—পরিপূর্ণ আনন্দের, জীবনের চরম চরিতার্থতার অসহ্য অনুভূতি—'মার্চ্চেণ্ট্ অব্ ভিনিসে'র শেষ অঙ্কের মতো গভীর, শুমান্-এর 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র মতো কোমল। সাগরের ইহ-জীবনে আর কিছু কামনীয় নাই; এতদিনে সে নিজকে ফিরিয়া পাইয়াছে; এই আত্ম-উপলব্ধির নূতন চেতনা তাহার শরীরের রক্তকে মাতাল করিয়া দিল।

প্রকাণ্ড কলিকাতায় সামান্য একটা চাকরি জুটাইয়া লইতে আর কতক্ষণ;—দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত লালদীঘি-অঞ্চলের প্রাসাদ-কারাগারগুলির গণনাহীন কয়েদীর মধ্যে সে-ও একজন মাত্র। তাহার পাঞ্জাবীটা খুব ফর্সা নয়,—টিফিনের ছুটীতে একগ্লাশ জল ও একটি সিগারেটের ধূম তাহার একমাত্র পানীয় —এবং খাদ্য; তাহার পাশে বসিয়া টাক-পড়া, রূপার চশ্মা-চোখে যে-লোকটি প্রত্যহ কাজ করে, সাগরের অকেরাণীত্ব-র কল্পনা করিতেও সে অক্ষম! সে মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়; ভুলচুক হইলে সাহেবের ধমক খায়,—সাহেবের চোখে সে জনৈক ক্লার্ক বই আর-কিছু নয়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় যে-যুবকের প্রিয়া-সম্মিলন নিশ্চিত, সে যেমন সমস্ত দিন সংসারের অসংখ্য ছোট-খাটো উৎপাত হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তেম্নি সাগরও এ-সকল ক্ষুদ্র লাঞ্ছনা গায়েও মাখে না;

মনে-মনে বলে, কয়েক ঘণ্টা পর আমি যে-স্বর্গে ঢুকিব, তুমি যদি একবার তাহা দেখিতে পাইতে, সাহেব, তাহা হইলে ঈর্ষায় তোমার অমন ফর্সা রঙ্‌ও বেগুনি হইয়া যাইত। সেই চশ্‌মা-চোখে টাক-পড়া ভদ্রলোকের প্রতি তাহার অনুকম্পার সীমা নাই।

অপরাহ্ণ বাড়িয়া চলিয়াছে; সন্ধ্যার দেরী নাই। ড্যাল-হাউসি স্কোয়ার্‌-এর চারিপাশ বাহিয়া কেরাণীর ঢল্‌ নামিল, সাগর সেই বিশাল স্রোতের ছোট একটি ঢেউ। কোনমতে একটা বাস্‌-এ একটুখানি জায়গা করিয়া নিয়া সে তাহার হোটেলে ফিরিল। তাহার আচরণে লেশমাত্র ব্যস্ততা নাই, বিশ্রাম বা চায়ের জন্য সে আদৌ অস্থির নয়। ধীরে-সুস্থে সে স্নান করিল; তারপর নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, চাকরটা জল গরম করিয়া চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিয়াছে। চুল আঁচ্‌ড়াইয়া সে নিজ হাতে চা-টা ছাঁকিল, ঘরের একটিমাত্র টেবিলের উপর এক পেয়ালা উজ্জ্বল বাদামী বর্ণ চা রাখিয়া সে সুইচ্‌টা টিপিয়া ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে বসিল। চেয়ারটা শক্ত —কিন্তু টী-পট্‌-এর মধ্যে আরো অনেক চা আছে।

এতক্ষণে!—বাইবেল্‌-উক্ত কপালের ঘাম খরচ করিয়া সে জীবিকা-উপার্জ্জন করিয়াছে, এখন সমস্ত রাত্রিটি তাহার। বই-গুলির জন্য সে তেমন আরামের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, কিন্তু অন্য দিক দিয়া এই অনাদর সে সাড়ে-ষোল আনায় পূরণ করিয়া দিতেছে। টিনের মধ্যে সিগারেট ও তাহার মাথার খুলির মধ্যে বহু আইডিয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাত বাড়িয়া চলিলে

তাহার কিছু আসে যায় না; তাহার ঘুম পাইলে সে টের পাইবে।

সাগর এতকাল যাহা কিছু লিখিয়াছে, ভুল লিখিয়াছে; এই মুহূর্ত্তে যে-জীবন সূর্য্যোদয়ের মতো তাহার কল্পনার সমুদ্র হইতে লাফাইয়া উঠিল, তাহার বর্ণচ্ছটা সাগর রায় ... এক লেখক কখনও দেখে নাই। সাগর রায়কে সে মারিয়া ফেলিবে; তাহার স্থানে সে একজন অপরিচিতকে বসাইবে—

—কী ছদ্মনাম নে'য়া যায়, বলো তো ফাউস্‌ট্‌?

উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়াই সাগরের খেয়াল হইল, ফাউস্‌ট্‌কে উপরে নিয়া আসিবার অনুমতি কর্ত্তারা দেয় নাই; তাহাকে নীচে জমাদারের জিম্মায় রাখিয়া আসিতে হইয়াছে।

অবগাহন

১

গোয়ালন্দ হইতে সে ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল; ক্যাল্‌কাটা হোটেলের দোতলায় তাহার জন্য দুইটি ঘর তৈরি হইয়া ছিল; তাহারই একটিতে জিনিষপত্র, এবং জিনিষপত্রের পাহারায় ফাউস্‌টুকে রাখিয়া, শুধু এক পেয়ালা চা খাইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়িল, কলিকাতার মসৃণ ধূসর রাস্তাগুলির মুখে প্রভাতের হলুদ রৌদ্রালোক তখন সবেমাত্র প্রথম পোঁচ দিয়াছে। ফাল্গুন মাস—সকালবেলাটায় তখনও বেশ শীত-শীত করে।

আমহার্স্ট্‌ স্ট্রিট্‌ ডাকঘরে গিয়া সে প্রথমে ব্যোমকেশকে একটা মামুলি তার পাঠাইল; তারপর ধীরে-ধীরে তাহার গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে পা চালাইল। জায়গাটি বেশি দূরে নয়। সত্যবানকে সেখানেই পাওয়া যাইবে, এ-বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না।

ও-পাড়ায় নম্বর দেখিয়া বাড়ি বাহির করা দুঃসাধ্য। সাগর কিছুক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করিয়া যে-দোতলা বাড়িটির সাম্‌নে দাঁড়াইল, অনুমানে তাহাকেই তেত্রিশ নম্বর বলিয়া মনে হইল। তবু নিশ্চিত হইতে না পারিয়া সে ঢুকিবার পূর্ব্বে ইতস্তত করিতে লাগিল।

নীচের তলায় রাস্তার ঠিক উপরে যে-ঘরটি, তাহার বাসিন্দার একটু আগেই ঘুম ভাঙিয়াছিল। মোটাসোটা, থল্‌থলে দেহটিকে স্বল্প বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিবার একটা পরিহাস করিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া কহিল—কাকে চান্‌ বাবু?

দুঃস্বপ্নের মত এই মূর্ত্তিকে দেখিয়া সাগর প্রায় ভড়্‌কাইয়া গিয়াছিল। কিঞ্চিৎ মানসিক বল সংগ্রহ করিয়া সে বলিল, নির্ম্মলা এ-বাড়িতে থাকে?

—নির্ম্মলা? ও, নিম? তাই বলুন্! ও আমার শত্তুর কিনা তাই ওর সঙ্গে আমি নিম পাতিয়েছি—বলিয়া মনের আনন্দে সে এক পংক্তি কালো দাঁত বাহির করিয়া সরবে হাসিয়া উঠিল।

—নির্ম্মলার কোন্ ঘর?

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? উঠে' আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

দুই সার ঘরের মাঝখানে অল্প একটু নোঙ্‌রা, স্যাঁৎসেঁতে জায়গা;—সাগর সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা যাহার শত্রু, সে-ব্যক্তি দরজার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল, ভেতরে এসে একটু বস্‌বেন না?

—নির্ম্মলার কোন্ ঘর একটু বলে' দাও না!

—দিচ্ছি গো বাবু, দিচ্ছি। বাবাঃ—নিম্মলা বলতে যেন ফিট্ হ'য়ে পড়ে সবাই! অথচ ঐ তো—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া সে একটি গভীর অর্থসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।—সখ্ বটে চাঁদের! এই পের্ত্তুযে কেউ যেন আকুল হ'য়ে বসে' আছে ওঁর জন্যে!

কথাগুলি ক্রমশ নিমের মতই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সাগর নিঃশব্দে ভিতরের দিকে পা বাড়াইল;—নির্ম্মলার ঘর বাহির করিয়া নিতে পারিবেই।

—ও কি?—রাগ করে' চল্‌লে কোথায়, বাবু? সংসারে সত্যি কথা বল্‌লেই তেতো লাগে।। নিমের ঘরে কাল সারারাত হল্লা হয় নি তো—এখন সে মেঝেয় পড়ে' লোটাচ্ছে না কিনা! যাও বাবু, নিজ চক্ষে পের্‌তক্ষ করে' এসো গে। গরীবের কথা বাসি হ'লে কাজে লাগ্‌বে। সারা বাড়িতে এই সকালবেলা কেউ যদি জেগে থাকে তো আমার নাম ভুবনেশ্বরীই

নয়। ঘুরে’-ঘুরে শেষকালটায় এখানেই আস্‌তে হ’বে গো—মোহর নিয়ে সাধাসাধি কর্‌লেও আর-কেউ মুখ ফিরে’ও তাকাবে না। যাও না বাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ? ঐ যে বাঁ দিকে সিঁড়ি রয়েছে—ওপরের একেবারে কোণের ঘরই নির্ম্মলার। যাই বাপু—সকালে উঠে’ একবার নারায়ণের নাম নেবারও জো নেই। বলিয়া সে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ করিয়া দরজা বন্ধ করিল।

সাগর ভয়ে-ভয়ে খোলা দরজা দিয়া ভিতরে উঁকি দিল। নির্ম্মলা যদি সত্য-সত্যই মেঝেতে পড়িয়া লুটাইতে থাকিত, তাহা হইলে—আজ তো নয়ই, কখনোই বোধ হয় সে ঘরে ঢুকিতে পারিত না। কিন্তু একা স্‌টোভ্‌ প্রায়-নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, তাহার উপর কেট্‌লি চড়ানো—আর নির্ম্মলা উব-হাঁটু হইয়া নতমস্তকে তাহার সাম্‌নে বসিয়া আছে। নির্ম্মলার পিঠ্‌ দেখিয়াই সাগর তাহাকে নিঃসন্দেহে চিনিল।

জুতার শব্দ করিয়া সে অসঙ্কোচে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, এত শিগ্‌গিরই আস্‌তে পার্‌লে?

সাগর ইচ্ছা করিয়াই বলিল না—আমি সত্যবান নই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্ম্মলা আবার বলিল, খাটের নীচে থেকে দুটো ডিম এনে দাও তো—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

আরো একটু পরে নির্ম্মলা বলিতে আরম্ভ করিল, কই, আমার কথা—

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই বাকি কথাগুলি আঠার মত তাহার মুখে আট্‌কাইয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্ত্তির মত নিষ্পলক চোখে সে সাগরের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগরের কাছে আসিয়া বলিল—আপনি সাগরবাবু না?

কিন্তু সাগর জবাব দিবার আগেই সে প্রফুল্লস্বরে বলিতে লাগিল—হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই সাগরবাবু। কবে এলেন এখানে? কোথায় উঠেছেন? আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সাগর শুধু শেষ প্রশ্নটার জবাব দিল, এখনো হয় নি। সেই জন্যেই তো এখানে এলাম। সত্যবান এখানেই থাকে তো?

নির্ম্মলা ঈষৎ লাল হইয়া হাসিমুখে বলিল, ঠিক নেই কিছু—যেমন ওর মর্জ্জি। তবে রোজই একবার আসে বটে।

—আজ সকালে আস্‌বার কথা আছে বুঝি?

—হ্যাঁ। কাল রাত্তিরে—কাল রাত্তিরে অনেক বাবুরা এসেছিলেন—ঢের টাকা, ফেরাতে পার্‌লুম না। দুটোর পর গেছেন সবাই। বমি করে' ঘর-টর ভাসিয়ে—সে এক বিশ্রী কাণ্ড। নিজের হাতেই তো কাচ্‌তে হ'ল সব! তখন মনে হ'ল, কেনই বা বেশি টাকার লোভ কর্‌তে যাই?—দু'টি প্রাণীর খাওয়া—তা'র জন্যে কতই বা টাকার দরকার! বাবুরা বিকেলেই বায়না দিয়ে গিয়েছিলেম, সত্যবানকে তখন থেকেই ভাগিয়ে

দিয়েছি—রাত্তিরটা কোন্‌-এক বন্ধুর বাড়ীতে কাটাবে, বলে' গেল। এখুনি তো আস্‌বার কথা।

সাগর বলিল—আমি তা হ'লে এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করি?

—বাঃ, তা কর্‌বেন বই কি! ঐ দেখুন, আপনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—আমি ছাইমাথা কী সব বকে' যাচ্ছি, আপনাকে বস্‌তে পর্য্যন্ত বলি নি! নাঃ—নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। বসুন না—না, না—ওখানে নয়, ঐ খাটটার ওপর—ওটা পরিষ্কার। নির্ম্মলা এক রকম সাগরের হাত ধরিয়াই তাহাকে বসাইয়া দিল। তারপর সহসা স্‌টোভ্‌টার উপর নজর পড়াতে বলিয়া উঠিল—ঐ যাঃ! চায়ের জল তো শুকিয়ে হাওয়া হ'য়ে গেলো।

ছুটিয়া কেট্‌লিটা নামাইয়া রাখিয়া:

আপনি চা খাবেন তো?

এই প্রশ্ন বাহুল্যজ্ঞানে সাগর চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নির্ম্মলা ঈষৎ ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, পেয়ালাগুলো সর্ব্বদা আল্‌মারিতে বন্ধ থাকে। গরম জলে আবার ধুয়ে' নিচ্ছি। দেবো আপনাকে এক পেয়ালা?

—দাও। সাগর বেশি কথা বলিতে পারিল না।

নির্ম্মলার কী খুসি! পেয়ালাগুলিকে কয়বার যে ধুইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিছুতেই যেন আর তৃপ্তি হয় না। স্‌টোভের উপর দুধ চড়াইয়া দুইটা ডিম গরম জলে ডুবাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডিম?

—খাই।

—তা হ'লে আরো ছুটো দিই। রীতিমত ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

সাগর সত্য কথা বলিল—আমারো।

ক্ষিপ্র নিপুণতায় চা ও ডিম তৈয়ারি হইল। খাটের কাছে একটা চেয়ার আনিয়া দিয়া নির্ম্মলা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—ওঃ হো —ভুল হ'য়ে গেছে। বাক্সের ভেতর একটা কাপড় আছে—সেটা বিছিয়ে দিচ্ছি।

সাগর আপত্তি করিল, কিন্তু কার আপত্তি কে শোনে? চেয়ারটা নাকি আশানুরূপ পরিচ্ছন্ন নয়। সুতরাং উহার গায়ে—বেমানান্ হইলেও—একটা ধব্‌ধবে টেব্‌ল্-ক্লথ্ পরাইতে হইল।

এতক্ষণে নির্ম্মলা নিশ্চিন্ত হইয়া নীচু তক্তপোষটিতে বসিল। সাগর চায়ে চুমুক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যবান কোনো কাজ-টাজ পেয়েছে?

প্রশ্নটার উত্তর দিতে নির্ম্মলার একটু দেরি হইল, কারণ সেই মুহূর্ত্তে সে মুখের ভিতর প্রায় আধখানা ডিম ঠাসিয়া দিয়াছিল। তাড়াতাড়ি গিলিতে গিয়া খানিকটা তাহার গলায় ঠেকিয়া গেল; খক্‌খক্ করিয়া কাশিয়া উঠিয়া সে সেগুলি পেটের ভিতর ঠেলিয়া দিবার জন্য চায়ের পেয়ালায় এমন অসংযত চুমুক দিল যে সেই গরম তরল পদার্থগুলিতে তাহার জিভ্ তো পুড়িলই, তার উপর, সেগুলি ভদ্রভাবে গন্তব্যস্থানে না পৌঁছিয়া তাহার মুখ ও নাক দিয়া বাহির হইয়া আসিল। নির্ম্মলা বিষম খাইয়া অস্থির, সাগর হাসিয়া খুন!

নাকের চা ও চোখের জল মুছিয়া নির্ম্মলা নিজেও সে-হাসিতে

যোগ দিল।—আজ্‌কে আমার কি যেন হয়েছে বাস্তবিক—একটুকো সুস্থির হ'তে পার্‌ছি নে। এমন গোগ্রাসে গিল্‌ছিলাম যেন কতকাল কিছু খাই নি। কী বিশ্রী কাণ্ড—ভাগ্যিস্‌ আপনি আমার সম্বন্ধে যা ভাব্‌ছেন, ভদ্রতার খাতিরে মুখের ওপর তা বল্‌বেন না!

—ঠিকই বলেছ; মুখের ওপর স্তুতি-করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

—স্তুতি মানে কী?

হাসি লুকাইবার জন্য সাগর নীচু হইয়া পেয়ালায় চুমুক দিল। বলিল—জানো না যখন, জেনে কাজও নেই তোমার। তুমি একেবারে মুখ্‌খু।

নির্ম্মলা মাথা নাড়িয়া সায় দিল—শুধু কি তা-ই? কুচ্ছিতও।

—তা তো চোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার চেহারার একটা বর্ণনা শুন্‌বে? গায়ের রঙ্‌ কালো, চ্যাপ্‌টা নাক, ছোট চোখ, চওড়া কপাল (চুলগুলো অমন উল্টিয়ে দাও কেন?), নীচের ঠোঁটটা পুরু—দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক। শুন্‌তে কী বিশ্রী!

—ভাগ্যিস্‌ দেখ্‌তে অতটা নয়। মাগো—তা হ'লে মরে'ই যেতাম।

—নয় নাকি? কি করে' জান্‌লে?

—জানি, জানি। মানুষের চেহারা তো আর শুধু নাক-চোখের একটা লিষ্টি নয়—তা ছাড়াও কিছু। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এক-এক সময় আমার রীতিমত ভালোই লাগে। অন্যেরও লাগে নিশ্চয়ই—আমার চেহারার খুঁত আমি নিজে যতটা জানি, আর-কেউ কি আর ততটা জানে?

—তুমি ভারি বকর্‌বকর্‌ করতে পারো, নির্ম্মলা।

—বাস্তবিক! ভাগ্যিস্‌ আমাকে ঘরের বৌ হ'তে হয় নি। শুন্‌তে পাই, সারাদিন ওদের নাকি মুখ বুজে' কাটাতে হয়—কথা বল্‌তে হ'লেও ফিস্‌ফিসের ওপরে নয়। কী সাংঘাতিক! আমি হ'লে তো মরে'ই যেতাম! এক-এক সময় তাই মনে হয়—হ'লামই বা সবার নীচে,—তবু, ভদ্রঘরের বৌ হ'তে হয় নি, এটাই বা কম ভাগ্যের কথা কী? ইচ্ছে হ'লে চ্যাচাতে পারি তো—বাধা দেবার কেউ নেই।

—আপাতত আমি আছি। চা-টা খেয়ে নাও—তারপর যত খুসি চেঁচিয়ো। নইলে জল খেতে হ'বে।

—তাই তো—খাবার কথা ভুলে'ই গেছ্‌লাম। অথচ ক্ষিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেটটা—কাল রাত্তিরে কিছু খাওয়াই হয় নি। বাবুরা এক ঝুড়ি চপ-কাট্‌লেট্‌ এনেছিলেন—দায়ে পড়ে মুখে তুলতে হয়, কিন্তু দোকানের জিনিষ খেতে এমন ঘেন্না করে আমার! সেদিন পাশের ঘরের কম্‌লি বল্‌ছিলো, দোকানে নাকি সাপের চর্ব্বি দিয়ে সব জিনিষ ভাজে—সত্যি? মাগোঃ—মনে করতেও গা-বমি বমি করে।

—ও-সব কথা না ভেবে—হাতের কাছে যেগুলো রয়েছে, খেয়ে ফেলো দিকি!

—খাচ্ছি। নির্ম্মলা লজ্জিত হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত খাইতে লাগিল।

সাগর তাহার শেষ হইবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া রহিল। শেষ চুমুক দিয়া পেয়ালা ইত্যাদি নামাইয়া রাখার পর সাগর

দুইটি সিগারেট্ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খাও নাকি ?

নির্ম্মলা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, সাধ করে' কি আর খাই ! ভোট্‌কা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্‌টে' আসে।

সাগর নিজে সিগারেট ধরাইয়া বালিশে হেলান দিয়া অস্বাদিতপূর্ব্ব আরামে ধোঁয়া ছাড়িল।—এইবার বলো দেখি, সত্যবান এখন কী করছে ?

সত্যবান সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, সে এখন কিছুই করছে না, সাগর। নির্ম্মলা বলে, তা'র যা টাকা আছে, তা দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

নির্ম্মলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চা এই মাত্র শেষ হ'ল। আবার করবো ?

—না। সত্যবান ধুপ্ করিয়া সাগরের পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ক'দিন ধরে'ই মনে হচ্ছিল যে তুমি আস্‌বে। কাল্‌কেই তোমার কথা হচ্ছিল।

—কোথায় ?

—মুকুলেশবাবুর সঙ্গে।

—মুকুলে—শ ? মুকুলেশকে মনে করিতে সাগরের একটু সময় লাগিল।—ও, মনে পড়েছে। তাঁর সঙ্গে এখনো আলাপ রাখ্‌ছ ?

—তিনি রাখ্‌ছেন—ছাড়্‌বার উৎসাহ আমার নেই। নেহাৎ মন্দও নয়—চালচুলোর খোঁজ নেই তো আমার—তাঁর আতিথ্য সময়-সময় কাজে লেগে যায়। এই কাল্‌কেই তো তাঁর ওখানে

ছিলাম রাত্তিরে। জানোই তো, নির্ম্মলার মাঝে-মাঝে আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার দরকার হয়—অবিশ্যি আমাকে পুষ্‌বার জন্যেই অনেকটা।

—নিজের দোষেই তো এ-অবস্থা তোমার। একটা কাজ-কর্ম্ম বাগিয়ে নিয়ে আলাদা সংসার পাত্‌লেই পারো।

—পানার মতো ভেসে বেড়াই—এই বেশ। শেকড় গজালেই মুস্কিল। নির্ম্মলারও তা-ই মত। তবু চেষ্টা না করে'ই হাল ছেড়েছি, মনে কোরো না। অনেক ঘাটের পানি খেয়ে ঠিক কর্‌লাম, আর ঘাটে নেমেই দরকার নেই। প্রথমে একটা ইস্কুলমাষ্টারি জুটে' গেলো—বিধাতাপুরুষের সুপারিশে। হাওড়ায়। কল্‌কাতা থেকে আসা-যাওয়ার হাঙামাতেই শরীরের হাড়গুলো চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে' উঠ্‌লো। অনেক করে' ওদের তো থামালাম। কিন্তু একদিন একজন হ'লেন অনুপস্থিত—হেড্‌মাষ্টার আমাকে বল্‌লেন ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে ড্রয়িং করিয়ে আস্‌তে। আমি ছিলাম ইংরিজির মাষ্টার—

—বুঝ্‌লাম। চটে'-মটে' কাজে ইস্তফা দিলে তো?

—সেইদিনই। তারপর কিছুদিন বেশ সুখে ছিলাম ভাই—একটা সাহেবী হোটেলের স্‌টুয়ার্ড হ'য়ে। লম্বা মাইনে—কাজ চাকর-খাটানো। অসুবিধের মধ্যে প্যাণ্ট্‌-কোট্‌ পর্‌তে হ'ত—তা ওরাই একটা স্যুট্‌ দিয়েছিল—ফেরৎ আর নেয় নি।

—ওটা ছাড়্‌লে কেন?

—আমি আর ছাড়লাম, কোথায় ওটা—আমার কপালগুণে হোটেলই তুল্‌লো পটল। তুল্‌বে না? ব্যাটারা পাকা ব্যবসাদার

বলে'ই তো আমার মতো লোককে দেড়-শো টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছিল !

—তারপর ?

—তারপর গোটা-কয়েক প্রাইভেট্ ট্যুশানি চেখে দেখ্‌লাম—রুচ্‌লো না। আর একটা ইস্কুলমাষ্টারি নাকের কাছে এসে ঝুল্‌ছিলো—ওটা ছেড়ে দিলাম। নির্ম্মলার মুখে খবর পেলাম, আমার শরীর নাকি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।

নির্ম্মলা মাঝখানে বলিয়া উঠিল, শরীরের দিকে নিজের কোনো নজর নেই বলে' যেন অন্য-সবাই চুপ করে' থাক্‌বে ! অথচ, একটা না একটা উপসর্গ তো লেগেই আছে ! রোজ প্যান্‌প্যানানি শুন্‌তে তো আমাকেই হয়। শরীরে যার টোকা সয়না, তার আবার টাকা রোজগার কর্‌বার সখ কেন ?

—সে-সখ মিটেছে। শেষকালে যে-কেরাণীগিরিটা পেয়েছিলাম, তা-ও কাল ছেড়ে দিয়ে এলাম।

নির্ম্মলা এ-সংবাদ জানিত না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

—ওপরওয়ালার হুকুম। যাক্—রক্ষে পাওয়া গেল।

—ও, চাক্‌রি গেছে, বলো !—নির্ম্মলা হাত-তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।—অপরাধ ?

—অপরাধ তোমার। রোজ যেতে দেরি হ'ত—তাই। কিন্তু, নির্ম্মলা রোজ রাঁধ্‌তে দেরি করে, এ-ওজর দেখালে তো আর সায়েব-ব্যাটা মান্‌তো না !

—মেনে কাজও নেই। আমি খুসিই হয়েছি—এইবার তোমাকে পুরীতে পাঠাতে পার্‌বো।

সাগর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার জায়গায় অন্য লোক নিয়েছে ?

—এখনো নেয় নি, তবে কাল-পরশুর ভেতরেই—

—আমাকে ঠিকানাটা দাও তো সত্যবান—আজ্‌কেই সেলাম ঠুকে' আসি একটা।

—মানে ?

—অবিশ্যি আরো ঢের য়্যাপ্লিকেশ্‌ন্‌ পড়্‌বে। তবু চেষ্টা করে' দেখ্‌তে দোষ নেই।

—তুমি চাক্‌রি খুঁজ্‌তে এসেছ নাকি এখানে ?

—তবে আবার কী ? পাতা-বাহার হ'য়ে থাক্‌তে আর ভালো লাগ্‌ছে না।

—তুমি এ চাক্‌রি কর্‌বে কী ? পঁচাত্তর টাকা মাইনে—

—এত্তই ? তুমি এক্ষুনি আমাকে ঠিকানাটা দাও, সত্যবান।

—ব্যস্ত হোয়ো না। এখনো আপিস্‌ খোলে নি। আমিও না-হয় তোমার সঙ্গে বেরুবো। কিন্তু মৎলবখানা কী, বলো তো ?

—বিশেষ কিছু নয়—গোটা কয়েক কবিতা লেখা। কিন্তু তার জন্যে বেঁচে থাকা দরকার। তাই একটা চাকরিও চাই—যেমন-তেমন।

—মুকুলেশবাবু তোমার লেখা-টেকার কথা বল্‌ছিলেন। একবার যাবে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ? সম্প্রতি তিনি আবার বিয়ে করেছেন।

—না—না, এবার আমি আর ঘর থেকেই বেরুতে পার্‌বো না, আমার সময় কোথায় ? তোমরা দু'জন আছ—আর-কোনো

সঙ্গী আমি চাই নে। আমি যে এখানে এসেছি, মুকুলেশবাবুকে সে-কথা বোলোও না, সত্যবান—চাই কি গায়ে পড়ে' আলাপ কর্‌তেও আস্‌তে পারেন।

—আচ্ছা। আর—তিনি শিগ্‌গিরই কল্‌কাতা ছেড়ে যাচ্ছেন—এলাহাবাদে একটা বেশি-মাইনের প্রফেসরি পেয়ে। সুতরাং তোমার ভয় নেই।

—সম্পূর্ণ নির্ভয় হ'ব যখন বাসাহারের সংস্থান জুট্‌বে। ন'টার বেশি বাকি নেই—চলো না, এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

সত্যবান গা-মোড়ামুড়ি দিয়া এক সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া বলিল—চলো।

২

লায়ন্স্ রেইঞ্জে একটা ফায়ার-ইন্শিয়োরেন্স্-আপিসের জম্‌কালো ফটকের সাম্‌নে আসিয়া সত্যবান বলিল, যাও।

—তুমি ?

—চাক্‌রি থেকে বর্‌খাস্ত করা হয়েছে, তা'র বন্ধুতা সাহেবের চোখে একটা রেকমেণ্ডেশ্যন্ না-ও হ'তে পারে। বুঝ্‌লে না ?—মানে, বুক টান্ করে' সটান্ হুজুরের কাছে হাজির হও গে—আমি ততক্ষণ ল্যাম্পপোস্‌টে হেলান্ দিয়ে একটু দার্শনিক গবেষণা করি।—সাগর, তুমি কাণ্ট্ পড়েছো ?

—পড়ি নি। তবে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, সবি ক্যাণ্ট্।—আচ্ছা।

সাগর ভিতরে ঢুকিয়া যাইতেছিল, সত্যবান ডাকিল : আরে, শোনো। তোমার উৎসাহ দেখে আশা হচ্ছে, কিন্তু বলো তো সাহেবের ঘর কোন্ তলায়।

—তাই তো! সাগর মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল—তা হ'লে schooling হোক্।

—ঢুকেই বাঁ দিকে সিঁড়ি রয়েছে, দেখ্‌বে—

—সেটা দিয়ে উঠে'—

—সেটা দিয়ে না উঠে' সোজা এগিয়ে গেলে লিফ্‌ট্ পাবে। তেতলায় যেখানে নাম্‌বে—

—সেখান থেকে সাহেবের ঘর বার করে' নিতে পার্‌বোই। আর কি ?

—আর আবার কী ? কার্ড আছে ? নেই তো ? ভালোই। কেরাণীর আবার কার্ড থাক্‌বে কেন ? তোমার জামা-কাপড়

একটু নোঙ্‌রা হ'লে ভালো হ'ত। যাক্‌গে—তা'তে এমন-কিছু আসে যায় না। সাহেব জাতে আইরিশ্‌—লোক ভালো। চাপ্‌রাশির রাশি দেখে ঘাব্‌ড়ে যেয়ো না। দেরি হ'লে ধৈর্য্য হারিয়ো না। সাহেবরা বাসিমুখের চাইতে হাসিমুখ পছন্দ করেন। —মনে থাক্‌বে তো সব ?

—তোমার উপদেশ যদি দশগুণ হ'ত, আর আমার স্মরণশক্তি আদ্ধেক—তবু মনে থাক্‌তো। পালিয়ো না কিন্তু—ফিরে এসে কাণ্ট্‌ শোনা যাবে।

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সাগর দেখিল সত্যবান ল্যাম্পপোস্‌টে হেলান্‌ দিয়া মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—হাত দুইটা জামার পকেটে ঢোকানো, মুখ নত, ঠোঁটে একটা বর্ম্মী চুরুট জ্বলিতেছে, কিন্তু ধোঁয়া বাহির হইতেছে না।

সাগর তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলে ?

—ঠায়। এক ফুট্‌ফুটে বিলিতি মেয়ে ছাতা দোলাতে-দোলাতে যাচ্ছিলো—আমাকে দেখে থেমে হিন্দিতে জিজ্ঞেস্‌ করলো, আমার কী হয়েছে ? আমি কথা না বলে' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গা-মোড়ামুড়ি দিলাম। হঠাৎ ডান্‌ হাতের চেটোয় টুক্‌ করে' একটা টাকা পড়্‌লো। ব্যাপারটা যখন বুঝ্‌লাম, মেমসাহেব তখন অনেকদূর।

—তোমাকে বোবা ভেবে ভিক্ষে দিয়ে গেলো ?

—যা-ই বলো, রাজার জাত। একটা আস্ত টাকা—ভাবৃতে পারো ? ওদের কাছে চাইতেও হয় না !

—মেয়েটা নিশ্চয়ই প্রেম কর্‌তে যাচ্ছিল। তাই অত দিল্-খোলা।

—আহা, চিরকাল ও প্রেম করুক্, ভাই—ওর যদি সাত বোন্ থাকে সবাই যেন রোজ অভিসারে বেরোয়। ব্যবসাটা মন্দ নয় কিন্তু। তোমার যদি আস্‌তে আর-একটু দেরি হ'ত, হয়-তো আরো-কিছু রোজগার হ'য়ে যেতো।

—দেরি কর্‌তে আর পার্‌লাম কোথায়? সাহেব জবাব দিয়ে দিলেন।

—লাভ্‌লি! ভিক্ষে কর্‌বে আমার সঙ্গে?

—আপাতত নয়। সাহেব বাস্তবিক লোক ভালো। আমাকে কাল থেকেই আস্‌তে বল্‌লেন।

—চাকরি হ'ল?

—হ'ল। আমিই প্রথম ক্যাণ্ডিডেইট্। রাতারাতি বরাত খুলে' গেলো।—চলো আমার হোটেলে। একটা ট্যাক্‌সি নেবো।

ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া সত্যবান বলিল, আমাকে ট্যাক্‌সিতে চড়িয়ে একেবারে দিল্লী দেখিয়ে আন্‌লে, মনে কোরো না। সত্যবান মিত্র প্রায়ই মোটারে চড়ে' থাকে। Real মোটার।

—Real মানে?

—ভাড়াটে নয়। মুকুলেশবাবু বিয়ের পর একটা ফিয়াট্ কিনেছেন—

—তমি দেখ্‌ছি একটি খাঁটি প্যারাসাইট্। নির্ম্মলা খেতে-পর্‌তে দেয়, মুকুলেশবাবু জোগান বিলাসিতা—

—Brilliant আছি! প্যারাসাইট্‌ কী বল্‌ছ ব্যাঙ্‌! চার্ম্‌, বলো! চার্ম্‌! যে হতভাগাদের ও সব বালাই নেই, যারা নিতান্তই সাদাসিধে, সৎ—তারাই খেটে-খুটে হায়রান্‌ হয়। আমরা 'greater race'—charm ভাঙিয়ে খাই। আজ-কালকার বিখ্যাত আর্ট্‌-ক্রিটিক্‌ ভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে তো দ্যাখো নি? চেহারা দেখেছো কি গিয়েছো, আর আধ-ঘণ্টা আলাপ কর্‌লে তো কথাই নেই। এ-জন্মের মত তাঁর গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে। ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন নেবুতলা থেকে গোলদীঘি অবধি হেঁটেছিলাম—অসংখ্য লোকের সঙ্গে আলাপ তাঁর—থেমে-থেমে আস্‌তে-আস্‌তে ঐটুকু পথ এক ঘণ্টায় কাবার হ'য়ে গেলো। সবাই গায়ে-পড়ে' তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ কর্‌ছে—তিনি এড়াতে চাইলেই মানে কে? কী সমীহ করে' কথা বলে—ধন্য হ'য়ে যাচ্ছে যেন। ভাব্‌লাম, penalty of fame। কিন্তু পরে শুনলাম—তিনিই বল্‌লেন—এই রিফ্‌-র‍্যাফ্‌-এর (তাঁর কথা) সঙ্গে আলাপ হওয়ার সামান্য একটু ইতিহাস আছে—তিনি এদের সবার কাছ থেকে দয়া করে' ধার-হিসাবে টাকা নিয়েছিলেন।

—সেই থেকে বুঝি charm culture কর্‌ছ।

—বাস্তবিক এটা একটা সায়েন্স্‌—বরং আর্ট্‌। আরও কর্‌তে পার্‌লে পায়ের ওপর পা তুলে' রাজার হালে দিন কাটানো যায়;—অথচ সাধারণ লোকের মত ঋণী হ'য়ে থাক্‌বার দরকার নেই—যারা দিচ্ছে, তাদেরই সৌভাগ্য।

—তাদেরো ঐ মত তো?

—তা বই কি। এই দ্যাখো, মুকুলেশবাবু রোজ আমাকে

যেতে বলেন—তাঁর বাড়িতে থাক্‌তে বলেন, তাঁর স্ত্রী যখন শপিং-এ বেরোন্‌, আমি যাই সঙ্গে।

—Brilliant আছ!

—অথচ, বাস্তবিক তাঁর কোনো কাজ হয় না আমাকে দিয়ে, সাধারণ লোকে যাকে কাজ বলে, তা হয় না।—এলাম নাকি? চলো তোমার ঘরটা দেখে আসি।

উপরে উঠিতে-উঠিতে সাগর বলিল, তুমি এত কথা বল্‌তে শিখ্‌লে কবে থেকে সত্যবান?

—সম্প্রতি। Charm-culture-এর ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। আবার ইচ্ছে কর্‌লে বোবাও সাজ্‌তে পারি।

—তা তো দেখ্‌লামই। খাম্‌কা তোমায় অন্য ভেবে মর্‌ছিলাম। জীবনে তোমার উন্নতি হ'বে।

—নির্ম্মলাকে এ-কথা বলে দেখো।

তাহারা ঘরে ঢুকিতেই ফাউস্‌ট্‌ আনন্দে লেজ নাড়িতে-নাড়িতে সাগরের গায়ে লাফাইয়া উঠিতে যাইতেছিল, অপরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। সাগরের মুখের দিকে আড়চোখে মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাকাইয়া যেন জিজ্ঞাসা করিল, ইনি আবার কে?

—কুকুর রাখ্‌ছ, সাগর?

—ওর নাম ফাউস্‌ট্‌। চমৎকার দেখ্‌তে—না? মণিমালা বল্‌তো, ওকে দেখে ওর 'ফাউস্‌ট্‌'-এর সেই কুকুরের কথা মনে পড়ে! তাই ওর নাম—

—মণিমালা কে?

—আমার স্ত্রী।

—স্ত্রী!

—স্ত্রী। কেন? আমি বিয়ে করতে পারি নে?

—বিচ্ছেদ না বৈরাগ্য? বায়রণ না বুদ্ধদেব?

—Don't be silly. বিয়ে করেছি এই ঢের, কিন্তু তা নিয়ে হৈ-চৈ করা আমার মত গরীবের পোষায় না। Jekyll and Hyde-এর গল্প জানো?

—এখন বুঝি Dr. Jekyll-এর সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছে?

—Rather. আমি দুটো জিনিষকে ভাগ করে' নিয়েছি। আমি বুদ্ধদেবের মত অমানুষ নই যে Hydeকে একেবারে বাদ দেবো, বায়রণ্-এর মত অতি-মানুষ নই যে তেলে-জলে মিশ্ খাওয়াবার চেষ্টা কর্‌ব।

—আইডিয়াটা বুঝ্‌লাম। কিন্তু এ-নবিশী কদ্দিনের জন্য?

—যদ্দিন না ক্লান্তি আসে।

—যদি ক্লান্তি না-ই আসে?

—ক্লান্তি আস্‌বেই? তখন মণিমালাকে মধুর লাগবে। আবার, সে-মিষ্টিতে যখন মুখ ফিরিয়ে আন্‌বে—

—তখন আবার কেরাণী-ও-কবি-system। বাঃ, চমৎকার প্ল্যান্—

সাগর একটা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আস্তে-আস্তে বলিতে লাগিল, না, প্ল্যান্ নয়। এটা কী, জানো? তোমার মনে আছে, সত্যবান্, একবার তুমি আর আমি একসঙ্গে 'Paracelsus' পড়েছিলাম? প্রথম অঙ্কের শেষের দিকটা মনে আছে?

—এক প্যারাসেল্‌সাস্‌ নামটা ছাড়া কিছুই মনে নেই, কারণ তার এক বর্ণও আমি বুঝি নি।

—সেই যে—প্যারাসেল্‌সাস্‌ বল্‌ছে : ডুবুরীর জীবনের দু'টি মুহূর্ত্ত—এক, যখন ভিক্ষুক সে জলে ডুব দেয়, আর, যখন রাজা হ'য়ে সে মুক্তো নিয়ে উঠে' আসে। তারপর—বলো তো, তারপর প্যারাসেল্‌সাস্‌ কী বল্‌ছে ?

—কী ?

—'Festus, I plunge.'

৩

সাগর রায় ডুব দিল। জীবনের অতলস্পর্শী সমুদ্রের ফেনিল আলিঙ্গন তাহাকে লুফিয়া লইয়াছে। কাচের ঘরে মহার্ঘ অর্কিডের মত দুর্লভ জীবনের অসাধারণ সুখ সে জানিয়াছে। এইবার ভাঙো, কাচের দেয়াল ভাঙিয়া ফেলো, ছায়ালোকের চির-গোধূলি উগ্র রৌদ্রসম্পাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাউক্, কবুতর-বুকের ধুক্‌ধুকানি আর সহিতে হইবে না—সঙ্কোচে আতঙ্কে আশঙ্কায় আর প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বাঁচিয়া সুখ আছে।

সাগরের দিনগুলি পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, রাত্রিগুলি গানের গুঞ্জনের মত অলক্ষিত দ্রুততায় ফুরাইয়া যায়—একের পরে আর, অন্তহীন দিন-রাত্রির মিছিল। রোজ ভোরে ঘুম ভাঙা মাত্র সাগরের মনে হয় আর একটি দিন! রোজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে গভীর পরিতৃপ্তির সহিত সে ভাবে: আর একটি দিন আস্‌ছে। সে যতদূর তাকাইতে পারে, ভবিষ্যতের শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত এই দিন ও রাত্রির অরণ্য বিস্তৃত হইয়া আছে—কোথাও শেষ দেখিতে পায় না।

এত ভোরে ওঠা তাহার পক্ষে সম্ভব, এ-কথা সে কখনো ভাবিতে পারিত না, কিন্তু, তাহাকে কখনো কেরাণীগিরি করিতে হইতে পারে, এ-কথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু সকালে ওঠা বাস্তবিক ভালো। আপিসের আগে সে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় পায়—পড়াশুনার জন্য। এতদিনে সে বাস্তবিক শেইক্‌স্‌পীয়্যর্ পড়িবে। ছেলেবেলায় সে যে সচিত্র বইখানার রসোদ্ঘাটন করিবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা

খুঁড়িয়াছে, সকল রহস্যের চাবী তাহার হস্তগত হওয়া অবধি সেই বইখানার গায়ে ধূলা জমিতেছে। সেই ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া এক মৃত অতীতকে সে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায়—নোয়াখালির সেই নদীতীর, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের স্বপ্নময় নিদ্রাবেশ, আরব্যোপন্যাসের রাজপুত্রের অশ্বখুরধ্বনি—সেই অপরূপ রহস্যের চেতনা, যেখানে চোখ পড়ে—সেখানেই বিস্ময়। বইখানার পাতা খুলিলেই তাহার সেই শৈশবকে সে দেখিতে পায়—শেইক্‌স্‌পীয়্যরের বিস্তৃত ও বিচিত্র পৃথিবীতে মৃত্যুহীন নর-নারীদের সঙ্গে ছোট একটি ছেলে ঘুরিয়া বেড়ায়—সাগর তাহার চোখ দিয়াই এই অভিনব জগৎকে দেখিয়া লইতেছে।

আপিসে একটানা সাত ঘণ্টা এক মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া যায়। কাজ করিতে কষ্ট কি সুখ—কিছুই সে অনুভব করে না। আপিসে ঢোকা মাত্র তাহার কতগুলি অনুভূতি যেন লোপ পাইয়া যায়—কলের মত নিরুদ্বেগে ও নির্ভুলভাবে সে কাজ করিয়া যায়।

কিন্তু বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণতা ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যা-যাপনের জন্য তাহার চিন্তা নাই—নির্ম্মলা ও সত্যবান তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সাগর যেন দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে, এম্‌নি ভাবে নির্ম্মলা তাহাকে আপ্যায়িত করে।

নির্ম্মলার ঘরে বসিয়া তাহারা তিনজনে যে-আলাপ করে, আজকালকার যুব-সম্প্রদায়ের পরিভাষা-অনুসারে তাহা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ নয়। ভাগ্যিস্, নয়! তাই তো সেখানে এমন একটি স্বাচ্ছন্দ্য—দিনের সব ক্লান্তি পরিপূর্ণ অবসরের মাধুর্য্যে

হাওয়ার মতো হাল্‌কা হইয়া যায়—পরিশ্রান্ত মন শান্তিতে সান্ত্বনায় আবিষ্ট হইয়া উঠিল—ফিরিবার সময় সাগরের উৎসাহ অগ্নিশিখার মত উচ্ছ্বসিত; যতই জোরে চলে, মনে হয়, যথেষ্ট জোরে চলা হইতেছে না—একেবারে দুই তিনটা লাফ দিয়া-দিয়া উঠে—ফাউস্‌ট্‌-এর সঙ্গে খেলা করে—এমন কি, মণিমালাকে চিঠি লিখিতে বসে। মণিমালার চিঠি সপ্তাহে দুইবার আসে। সে লেখে: গাঁদাফুলের শেষ ঝাঁক ফুরাইয়া গেল—শাদা গোলাপ দু' একটা করিয়া ফুটিতেছে, লালের দেখা নাই। মালী বলে, দক্ষিণের বাতাস আর একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেই চাঁপার কলি ধরিতে সুরু করিবে। বাবার শরীর ভালো নাই, তাঁহাকে নিয়া শিম্‌লা যাইবার চেষ্টায় আছি—তুমি যাইবে? সাগর জবাব দেয়: না। আপিসে ছুটি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। ভালোমত গরম পড়িবার আগেই তোমাদের যাওয়া দরকার—নহিলে ভালো বাড়ি পাইবে না। তোমার জন্য কিছু বই পাঠাইলাম। কেমন লাগিল, লিখিয়ো।

নির্ম্মলার কাছ থেকে ফিরিয়া আসিয়া মণিমালাকে চিঠি লেখার মতো শক্ত কাজও কেমন সহজ মনে হয়! ওখানে কাহারো বিদ্যার গৌরব নাই—তাই প্রতি মুহূর্ত্তে ভাণ করিতে হয় না; কেহ রসিকতা করিবার চেষ্টা করে না, তাই বহুবার হাসিবার উপলক্ষ্য ঘটে। দিন ফুরাইয়া রাত্রি আসিল; একটি তারা ডুবিয়া আর-একটি দেখা দিয়াছে। সাগরের মনে হয়, আর তাহার বাঁচিবার দরকার নাই, শুধু মৃত্যুই তাহার কাছে এখনও অনাবিষ্কৃত।

বাক্সে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া ফাউস্‌ট্‌ ঘুমায়, তাহার নরম, উষ্ণ গায়ে পা রাখিয়া সাগর কবিতা লেখে—কথার অজস্র শেফালিতে তাহার মন শুভ্র ও সুরভি হইয়া উঠে।

কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটানা সে লিখিয়া যায়—একটি-একটি করিয়া কথার ফুল ফোটে—কী আশ্চর্য্য সে ফুল!—পৃথিবীর আর-কিছুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। নিজের এই ক্ষমতায় সে নিজেই মুগ্ধ হয়, নিজের হাতের লেখার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া যায়। তিনটি শব্দ—সাধারণ, অনাড়ম্বর তিন শব্দ পাশাপাশি বসাইলে তাহারা আর শব্দ থাকে না—আগুনের মতো, আগুনের ফুলের মতো জ্বলিয়া ওঠে!—পৃথিবীতে আর মির‍্যাকল্‌ হয় না, এ-কথা মিথ্যা। 'Out of three sounds I frame, not a fourth sound'—

সাগর বলিয়া উঠে, বুঝ্‌লে, ফাউস্‌ট্‌—not a fourth sound, but a star!'

তারপর চেয়ারে হেলান্‌ দিয়া একটু বিশ্রাম করিতে হয়। ঘাড়টা ব্যথা হইয়া গেছে। সিগারেট্‌ ধরাইয়া মুখে তুলিতে ভুলিয়া যায়, শ্লথ দুই আঙুলের মাঝখানে তাহা পুড়িতে থাকে।

বসিয়া-বসিয়া সাগর একটি ছবি দেখে। ছবিটি সে কোথা হইতে পাইয়াছে, তাহা নিজেই জানে না। সম্ভবত কোনো বই থেকে। সম্ভবত একদিন ভোরের দিকে এই স্বপ্ন দেখিয়া

সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ছবিটি স্পষ্ট—রেখাগুলি দৃঢ়, মৃদু রঙ্—রূপালি-ধূসর। আকাশ ভরিয়া মেঘ করিয়াছে—বৃষ্টি আসিল বলিয়া। একটি প্রায়ান্ধকার ঘর মন্দিরের মতো ঠাণ্ডা। জানালা দিয়া সে আকাশ দেখিতেছে। তাহার শরীর এমন পরিচ্ছন্ন যে মানুষ কখনো অত পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না। ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, একটি মেয়ে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েটির মুখ সে চেনে না, কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে তাহার পুরোনো পরিচয়। মেয়েটির পরণে শাদা —বিধবার শাদা নয়, বধূর। তাহার কপালে ছোট একটি কাটা দাগ। চুল এলো। হাসিমুখ। মেয়েটি বলিল, এতদিন কেমন করে' ছিলে?

সাগর বলিল, এতদিন ছিলাম না,—এখন থেকে আছি।

—কিন্তু বৃষ্টিটা তো বেশ জোরেই এলো। কী করবে? না—না—আলো জ্বালিয়ো না। এই জান্‌লার আলোতেই হ'বে। দুটো চেয়ার টেনে আনো।

—তারপর?

—তারপর 'In a Gondola' পড়্‌বো দু'জনে মিলে'।··· এই যে, তুমি আগে। না—গোড়া থেকে নয়। আমিই পড়্‌ছি: 'the moth's kiss first!'···

সাগরের পালা আসিল:

'···Scatter the vision for ever!'

সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। এর বেশি সে কিছুতেই

ভাবিতে পারে না। ছবিটি অভ্যাসের সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে পাকা রঙে বসিয়া গেছে। আলাদিনের প্রদীপ ঘষিলেই যেমন দৈত্যের উদয়, তেম্‌নি চোখ বুজিলেই এই দৃশ্যের আবির্ভাব—রোজ একরকম—একচুল এদিক-ওদিক নয়।

কিম্বা কোনো দিন লিখিতে-লিখিতে হয়-তো খট্‌ করিয়া আট্‌কাইয়া গেল—একটা মিলের জন্য। সাগর হাত দিয়া সাম্‌নের চুলগুলি কপাল থেকে পেছনে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়—ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পাইচারি করে। এমন প্রাচুর্য্য কি করিয়া সম্ভব হয়? সে যেদিকে তাকায় সেখানেই কাব্যের বস্তু দেখিতে পায়, এত ঐশ্বর্য্য লইয়া সে কী করিবে? চিন্তার মতো দ্রুতগতিতে যদি লেখা হইত, তাহা হইলে তাহার রচনা দিয়া বিষুভিয়াষের বিশাল জঠর ভরিয়া ফেলা যাইত। কিন্তু কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে অসম্ভব সময় যায়—কত-কিছু অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে! অমিত রায়কে ঠাট্টা করিয়া সে বলে, যদি ভাষাই দিলে, ঈশ্বর, তবে একজনকে এত বেশি দিলে কেন? মাঝ-পথে অন্য-কাউকে কিছু দিলেও তো পার্‌তে—যেমন ধরো ঐ রবিঠাকুরকে।

সাগর ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। চুলের মধ্যে আঙুল ডাবাইয়া সে স্থিরচিত্তে কিছু ভাবিবার চেষ্টা করে। মনে-মনে হিসাব করিতে তাহার ভালো লাগে—যদি সত্তর বছর বাঁচি, তা হ'লে বাঙ্‌লাদেশে আর লেখক থাক্‌বে না—কি বলো, ফাউস্‌ট্‌?

সুখনিদ্রার মধ্যে ফাউস্‌ট্‌ অল্প একটু শব্দ করিয়া সায় দেয়।

সাড়া

এক শনিবার সাগর আপিস্ থেকে সোজা নির্ম্মলার ঘরে গেল;—সত্যবান অপরাহ্নে টেলিফোনে খবর দিয়াছিল; রহস্য করিয়া বলিয়াছিল, এলে যা শুন্‌বে, তা শুনে' খুসি হ'বে।

সুতরাং সাগর খুসি হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, খাটের উপর উহাদের দুইজনের মাথা পাশাপাশি যে-বস্তুর উপর ঝুঁকিয়া আছে তাহা একটুক্‌রা কাগজ। সত্যবানের হাতে একটা পেন্সিল্। সাগরকে দেখিয়া সত্যবান বলিল, পঞ্চাশখানা রেকর্ড্‌সমেত একটা ভালো গ্রামো-ফোনের কত দাম হয়, সাগর?

সাগর স্বীকার করিল যে উপস্থিত এই প্রশ্নের একটা আন্দাজি উত্তর দিতেও সে অক্ষম; কিন্তু সেই প্রশ্নের হেতুটাও অনুসন্ধান করিল।

সত্যবান অমায়িকভাবে জবাব দিল, একটা গ্রামোফোন থাকা ভালো। দূরদেশে সন্ধ্যার সঙ্গী।

—দূরদেশ? যাচ্ছ নাকি কোথাও? ত্রিচিনপলি না শ্রীনগর? সুখবরটা কি এই?

—শ্রীমতী নির্ম্মলা আমাকে আর এখানে টিঁক্‌তে দেবেন না মনস্থ করেছেন।

নির্ম্মলা ঘোরতর আপত্তি করিয়া উঠিল: হ্যাঁ—শুধু আমিই বুঝি! বেশ লোক কিন্তু! বন্ধু-র কাছে বলে' দেবো নাকি সব?

সত্যবান একটুও না ঘাবড়াইয়া বলিতে লাগিল: দাও না

ব'লে! পাণ্ডববর্জ্জিত সাঁওতাল পরগণায় আমি বাড়ি কিনেছি? না তুমিই তা'র আগে আমায় পরামর্শ দিয়েছিলে?

সাগর অপ্রস্তুতভাবে একবার ইহার একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দুইজনের কথা-কাটাকাটি অনুধাবন করিতে-করিতে আসল ব্যাপারটা বুঝিতে সাগরের অনেক সময় লাগিল। সে-বিসম্বাদ অত্যন্ত রুচিকর হইলেও এত দীর্ঘ যে তাহা আদ্যোপান্ত লিখিতে গেলে ঢের সময় লইবে। সুতরাং সঙ্ক্ষেপে সরল বাঙ্‌লায় ব্যাপারটি বিবৃত করা গেল।

সত্যবান ও নির্ম্মলা (নির্ম্মলা ও সত্যবান বলা উচিত) কলিকাতার পাত্‌তাড়ি গুটাইতেছে। এ-জীবন আর তাহাদের ভালো লাগিতেছে না—প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের মধ্যে এ-বিরোধ!—ভগ্নাংশে আর তাহাদের মন উঠিতেছে না। তা ছাড়া (এটা নির্ম্মলার) বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, চুল যখন পাকিতে সুরু করিবে, এবং (এটা সত্যবানের) আলু খাইবার বা না খাইবার জন্য ডাক্তারের অনুমতি চাহিতে হইবে, যখন শুধু বাঁচিয়া থাকাটাই উদ্দেশ্য হইবে, অন্য-কিছু নয়। ঠিক কথা, (সাগর সায় দিল) যদি কিছু করিতে হয়, এখনই করা উচিত। আর যে-কয়টা দিন হাতে আছে, নির্ম্মলা সত্যবানকে উপভোগ করিতে চায়—নিরবচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ। ব্যাঙ্কে তাহার যে টাকা ছিল (সংখ্যাটা শুনিয়া সাগর বিস্মিত হইল), তাহা দিয়া জশিদী ও দেওঘরের মাঝামাঝি জায়গায় এক বিস্তীর্ণ জনপ্রাণীশূন্য মাঠের মধ্যে ছোট একটি 'বাড়ি' কেনা হইয়াছে। বাড়িটি পুরোনো হইলেও বাসোপযোগী; তা'র উপর নির্ম্মলা কিছু মেরামত

করাইয়াছে। বাড়ি প্রস্তুত, এখন শুধু তাহাদের যাইবার অপেক্ষা। দু'টি প্রাণীর সংসারযাত্রানির্ব্বাহের জন্য কি-কি জিনিষ না হইলেই নয়, তাহারই ফর্দ্দ করা হইতেছিল। কলিকাতায় আর সপ্তাহখানেকের বেশি থাকিবার ইচ্ছা তাহাদের কোনমতেই নাই। পরিশেষে সত্যবান বলিতে যাইতেছিল যে কলিকাতা ছাড়িয়া নরকে যাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না, প্রকাণ্ড আকাশ ও রুক্ষ মাটির স্বর্গ তাহার সহিবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার অগোচরে—

এখানে নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল যে সত্যবান মুখে কিছু না বলিলেও আগাগোড়াই তাহার ইচ্ছা ছিল যে—ইত্যাদি।

আসন্ন বন্ধু-বিরহের দুঃখ অতিক্রম করিয়া সাগরের যে-প্রশ্ন উঠিল, তাহা এই : ওখানে গিয়ে খাবে কী তোমরা ?

সত্যবান বলিল, প্রশ্নটা শুনে' খুসি হলাম, সাগর। আমি যে কোনো কাজকর্ম্ম কর্‌ছি নে, সেটা না বল্‌তেই বুঝতে পেরেছো। নির্ম্মলা আমার চিরন্তন আল্‌সেমির ব্যবস্থা করেছে।

—গয়না বেচে বুঝি ?

—শুধু গয়না নয়, এখানকার খাট-দেরাজ-শাড়ি-কাপড়-বাসনকোষণ কাচের গেলাশ ডিকেণ্টার সব জলের দরে যাচ্ছে—মায় কর্ক-স্ক্রু ছুরি-চাম্‌চে। এখানকার কিছুই নাকি ও সেখানে নিয়ে যাবে না। শুধু ওর শরীরটাই—

নির্ম্মলা নির্ম্মল নির্লজ্জতার সহিত বলিল, ফর্‌মায়েস দিয়ে শরীর গড়াতে পার্‌লে সেটাও বদ্‌লাতাম বই কি! কিন্তু নতুন শরীরের সখ্‌ হয়েছে যে বড় ?

এই সকল কথা-কাটাকাটির অন্তরালে সারাক্ষণ যে-একটি আনন্দস্রোত প্রতি মুহূর্ত্তে বহিয়া যাইতেছিল, তাহা সাগরের কাছে অনাবিষ্কৃত রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই দুইজনের তুলনায় সে অনেক বুড়া হইয়া গিয়াছে—ইহাদের সৌভাগ্যে সে আনন্দিত হইতে পারে, প্রয়োজন হইলে দুই চারিটা সুপরামর্শও দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের এই উত্তেজনার—শোকে আনন্দে আশায় আশঙ্কায় জড়িত এই প্রবল অনুভূতির অংশীদার হইতে সে পারিতেছে না। অকপট গাম্ভীর্য্যের সহিত এই শিশুরা পুতুলের সংসার-জল্পনা করিতেছে—বয়ঃপ্রাপ্ত দুর্ভাগ্য সে, সেই পাতানো স্বর্গ হইতে বঞ্চিত।

হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল: তোমরা বিয়ে করো না কেন?

সত্যবান ইহার উত্তরে সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র ধরিয়া বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে যে চোখা-চোখা যুক্তিগুলি শানাইতেছিল, নির্ম্মলা এক কথায় তাহার সমস্ত ধার ভোঁতা করিয়া দিল: বিয়ে কর্‌তে চাইলেই কি তার উপায় আছে? কোন্ পুরুত—

সত্যবান রুখিয়া উঠিল—পুরুতের দরকার?—তিন আইন্ আছে, আদালতে গিয়ে দুটো নাম সই কর্‌লেই—ব্যস্, বাকি জন্মের মত হ'য়ে গেল।

নির্ম্মলাও উষ্ণস্বরে জবাব দিল—কী হ'য়ে গেল? বিয়ে? পুরুত ছাড়া যে-বিয়ে হয়, তা কি বিয়ে? এম্‌নিতে দু'জনে থাকি—সে আলাদা কথা। পাপ করেছি—বেশ, সংসার-সমাজের বাইরেই থাক্‌বো। বনবাসই আমাদের স্বর্গ। পাপই আমাদের

ধর্ম্ম-কর্ম্ম। কিন্তু আদালতে গিয়ে বিয়েকে মুখ-ভ্যাঙ্‌চানো—সে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। ধর্ম্ম না মানি, সে একরকম—তার প্রাশ্চিত্তি নিজেরাই কর্‌বো, কিন্তু ধর্ম্মের অপমান কর্‌লে ঈশ্বর তা সইবেন না।

সত্যবান হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর-বেচারীকেও টেনে আন্‌লে! কী পরিশ্রম ভদ্রলোকের—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কে কী কর্‌ছে না কর্‌ছে সব নোট্‌-বইয়ে টুকে' রাখ্‌তে হবে।

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, তাঁর পরিশ্রমের জন্য তোমার ভেবে মর্‌তে হবে না। তাঁর ঢের কর্ম্মচারী আছে।

—কর্ম্মচারীর মধ্যে তো উপস্থিত এক পুরুত-ঠাকুরকে দেখ্‌ছি—

নির্ম্মলা চোখ-মুখ লাল করিয়া শাসাইল, দ্যাখো, ফের যদি এ-সব জিনিষ নিয়ে ঠাট্টা করো, তোমাকে আর একটি পয়সাও দেবো না, বল্‌ছি।

সত্যবান বলিল, সাগর, আমার কি অপমানিত বোধ করা উচিত?

২

সন্ধ্যার পর তিনজনে মিলিয়া মার্কেটে গেল—বেড়াইতে। নির্ম্মলা ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া বলিল, জন্মের মত তো বুনো বর্ব্বর হ'তে চলেছি—তার আগে একটু শহুরে হাওয়া গায় লাগিয়ে আসি।

সাগর বলিল, আমাকে তোমরা নতুন বাড়িতে যেতে বল্‌বে না, নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা অভিনব অন্তরঙ্গতার সহিত সাগরের হাতের মুঠায় চাপ দিয়া বলিল, বল্‌বো বই কি, সাগর। কিন্তু এখন নয়। তোমার বই লেখা কদ্দূর হ'ল?

নির্ম্মলার মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া সাগরের হাসি পাইল। হাসি গোপন করিয়া সে বলিল, বই লেখা হচ্ছে। বেজায় খাটুনি। শেষ হ'য়ে গেলে তোমার বাড়ি গিয়ে দিন কয়েক জিরিয়ে আস্‌বো।

—ঠিক যাবে তো? ভুল্‌বে না? আমাদের ঘর সংসারের দশজনের মতো নয় বলে' ঘৃণা কর্‌বে না?

সাগর ও সত্যবান নির্ম্মলার কাঁধের উপর দিয়া কৌতুকের দৃষ্টি বিনিময় করিল। সাগর শুধু বলিল, না। নিশ্চয়ই যাবো।

—আচ্ছা, যদ্দিন না যাও, আমার জন্যে এই আঙ্‌টিটে পর্‌বে?—নির্ম্মলা তাহার আঙুল থেকে একটা নীল-পাথর-বসানো আঙ্‌টি খুলিয়া সাগরের বাঁ হাতের কনিষ্ঠায় পরাইয়া দিল।—আঙ্‌টিটে বন্ধক রইলো তোমার কাছে—এর বদলে নিলাম তোমার কথা। সে-কথা যখন রাখ্‌বে, তখন এ-আঙ্‌টি খালাস হ'বে। যদি না যাও, তা হ'লে কিন্তু চিরকাল তুমি আমার কাছে ঋণী হ'য়ে রইবে—মনে থাকে যেন।

—মনে থাকবে।

নির্ম্মলা সারাপথ তাহার নরম হাতের মুঠিতে সাগরের সেই হাতখানা ধরিয়া রহিল। সারাপথ কেহ আর কোনো কথা কহিল না।

৩

বিনা প্রয়োজনে তাহারা সারা মার্কেট্ বার-বার ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোনো জিনিষ কিনিল না। স্টল্‌ওয়ালারা প্রথমটায় দারুণ উৎসাহ দেখাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে ইহারা বাঙাল—এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছে।

বেশিদিন তিনজনে একত্র থাকিবে না, এই চেতনা নির্ম্মলা-সত্যবানের নিকট সাগরকে আরো মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। যেন বহুকাল পরে তিন পুরানো বন্ধুতে দেখা হইয়াছে—তিনজনে এম্‌নি হাসি-খুসি। এই দুই বন্ধু তাহার জীবনের পরিধির বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে, এই চিন্তায় সাগরের বুকটা মাঝে-মাঝে মোচড় দিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সে-কষ্ট অতি সামান্যই। পৃথিবীতে আজ আর এমন কিছু নাই, যাহা সাগরের না হইলেই চলে না—বাঁচিয়া থাকার জন্য ইহার-উহার মুখের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনকে সে অতিক্রম করিয়াছে—এখন নিজকে হইলেই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

মোটের উপর খুব স্ফূর্ত্তিতেই সময়টা কাটিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া তাহারা বিশ্রাম ও চায়ের জন্য হিন্দুস্থান-রেস্তোরাঁয় গিয়া ঢুকিল।

দোকান হইতে যখন বাহির হইল, তখন প্যালেস্ অব্ ভ্যারাইটিস্-এ সবে বায়োস্কোপ ভাঙিয়াছে। দীর্ঘ একসার মোটার রাস্তাটাকে গোগ্রাসে গিলিয়া রাখিয়াছে। অল্প একটু অগ্রসর হইয়া উহারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল।

হঠাৎ সত্যবান বলিয়া উঠিল, ঐ যে মুকুলেশবাবু—আর—তাঁর স্ত্রী। আলাপ কর্‌বে, সা—

কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সাগর যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানে নাই—রাস্তা পার হইয়া চলিয়াছে। একটা ট্রাক্ উল্টা দিক থেকে গর্জ্জাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—সাগরের খেয়ালই নাই। নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া উঠিল—এই সাগর—সাগর—

কিন্তু না—ট্রাক্ সাগরের গা ঘেঁষিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল;—মোটরের অরণ্য ভেদ করিয়া সাগর উল্টা ফুট্‌পাতে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—যেখানে মুকুলেশ ও তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া। তাহারা বায়োস্কোপ থেকে বাহির হইয়া সত্যবান-বর্ণিত ফিয়াটে উঠিবার মুখে।

নির্ম্মলা ও সত্যবান হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করিয়া সাগরকে অনুসরণ করিল। শুনিল, সাগর বলিতেছে : বারো বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। এবং তাহার উত্তরে মুকুলেশের স্ত্রী : না, তেরো বছর।

তারপর মুকুলেশ : আপনার সঙ্গে লক্ষ্মীর আলাপ আছে, সাগরবাবু? লক্ষ্মী, তুমি সাগরবাবুকে চিন্‌তে? কই, আমি তো—

মুকুলেশ কি ভাবে কথাটা শেষ করিবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া থামিয়া গেল।

নির্ম্মলা সত্যবানের কানে-কানে বলিল, চলো আমরা পালাই।

সত্যবান চলিয়া যাইবার একটা ভদ্র ছল খুঁজিতে লাগিল। মুকুলেশ লক্ষ্মী বা সাগরের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া সত্যবানের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল :

বায়োস্কোপে এসেছিলেন?

—না, এঁকে নিয়ে (নির্ম্মলাকে দেখাইয়া) একটু মার্কেটে। সাগরো ছিলো সঙ্গে।

মুকুলেশ বিনীতভাবে বলিল, এঁকে তো আমি—

—চিন্‌তে পার্‌ছেন না?—ইনি আমার স্ত্রী।

মুকুলেশ স্তম্ভিত।—কবে—

সত্যবান অত্যন্ত প্রফুল্লস্বরে বলিল, বিয়ে হয়েছে অল্পদিন। এখন হানিমুন্।

একটা খালি ট্যাক্‌সি দেখিয়া সে ইঙ্গিত করিল।

—আচ্ছা, মুকুলেশবাবু—কিছু মনে কর্‌বেন না। বড্ড busy। চোখে একটা দুষ্টু হাসির ঝিলিক আনিয়া:

বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছেন!

লক্ষ্মী আর সাগর আলাপ করিতেছে তো করিতেছেই! মুকুলেশ এক পা আগাইয়া ডাকিল—লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী বড় বেশি চম্‌কাইয়া উঠিল। এতক্ষণ কি সে ঘুমাইতেছিল?

—কেন?

—যাবে না?

—যাবো? ও—হ্যাঁ—লক্ষ্মী চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল—চলো। এসো, সাগর

লক্ষ্মীর পেছন-পেছন সাগর মোটারে উঠিল। মুকুলেশ হাসিতে-হাসিতে বলিল, আপনাকে আবার দেখে বড়ই প্রীত হ'লাম, সাগরবাবু। এখন কী কর্‌ছেন?

সাগর লক্ষ্মীর কপালের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার ও-দাগটা কিসের, লক্ষ্মী?

—চুরি করে' লিম্‌নেঞ্চু খেতে গিয়ে ঐটি অর্জ্জন করেছি। পাপের ছাপ।

দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। মুকুলেশ নিরুপায় হইয়া সিগার ধরাইল।

—তাই। ওটা তখন ছিলো না। আচ্ছা লক্ষ্মী, তুমি সে-রাত্তিরে গাড়িতে ওঠ্‌বার সময় জেগে ছিলে?

—না। পরের দিন ইষ্টিমারে চোখ মেলে সব মনে পড়্‌লো। মা-কে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম। তিনি যখন বল্‌লেন তুমি আসো নি—

—কেঁদেছিলে? হাত কাম্‌ড়েছিলে? মা-কে মেরেছিলে?

—আরো। রাগ ক'রে খাই নি।

—আমিও না। সেই সঙ্গে মা-ও না-খেয়ে ছিলেন।

—তোমার মা নিশ্চয়ই বুড়ো হন্‌ নি, সাগর?

—না। হ'বেনও না কখনো।

—হুঁ। আমারো সে-সন্দেহই হয়েছিলো। দীর্ঘজীবন তোমার মা-কে মানাতো না।

—আমাকে মানাবে?

—তোমাকেও না। তুমি এত ভালো যে তুমি আজই মর্‌তে পারো।

মুকুলেশ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ছেলেবেলাকার আলাপ বুঝি?

—তোমায় এ-শাড়িটে পেলে কোথায়, লক্ষ্মী?

—কেন?

—কী চমৎকার শাদা! আমার মা-র ও-রকম একটা ছিলো।

—তোমার মা-র শাড়িগুলো দিয়ে আজকাল কী হচ্ছে?

—এতদিন বাক্সয় তোলা ছিলো; ইদানী মণিমালা পর্‌ছে।

—মণিমালাকে কবে বিয়ে করলে?

—মাস চার।

মুকুলেশ হতাশ হইয়া হাতের সিগারটি সজোরে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিল।

—তোমার খুব বড় চুল হয়েছে, লক্ষ্মী?

—প্রকাণ্ড। জান্‌লা দিয়ে ছেড়ে দিলে রাজপুত্র বেয়ে উঠ্‌তে পারে। রাপুন্‌জেলের মতো।

—তুমি যদি রাপুন্‌জেল্‌ হ'তে, আর আমি সেই ভীরু রাজপুত্র—

—তা হ'লে আমাকে সেই মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করতে তুমি—

—করে' অনেকদূর দেশে নিয়ে যেতাম তোমাকে। পেছনে শত্রুরা তাড়া করতো। ধরা পড়্‌তাম—

—তোমাকে ওরা খুন করে' ফেল্‌তো—

—করুক্‌ গে খুন! আমি মরতে মরতে বল্‌তাম:

'Care not for the cowards! Care
Only to put aside thy beautiful hair,
My blood will hurt!'

—তারপর আমাকে নিয়ে ওরা—যাক্‌ গে। 'Scatter the vision for ever! And now—'

সাগর বলিল, 'As of old, I am I, thou art thou!'

জ্যস্‌টিস্‌ চন্দ্রমাধব রোডে একটা তেতলা বাড়িতে আসিয়া মোটার থামিল।

লক্ষ্মী, 'চলো আমার তেতলার ঘরে' বলিয়া সাগরকে লইয়া সেই যে উপরে চলিয়া গেল, না বদ্‌লাইল কাপড়-চোপড়, না বলিল অন্য কাহারো সঙ্গে একটা কথা। মুকুলেশ নীচে তাহার লাইব্রেরি-ঘরে বসিয়া মধ্যযুগীয় রোমান্স্‌ সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন-সম্বন্ধে এক গভীর গবেষণাপূর্ণ আন্‌কোরা নূতন বই পাড়বার চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মী ও সাগরের এই অদ্ভুত আচরণ কিছুতেই মন থেকে সরাইতে পারিল না। পড়িতে না পারিয়া একটা-একটা করিয়া সে বইখানার পাতা কাটিতে লাগিল—জিরাইয়া-জিরাইয়া। শেষ পর্য্যন্ত কাটা হইয়া গেলে সে একটা পেন্সিল্‌ নিয়া চাঁছিতে লাগিল। পেন্সিলের ডগা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে-হইতে ভাঙিয়া গেল। আবার কাটিল। তারপর আর-একটা পেন্সিল কাটিল। আর-একটা খুঁজিতেছে, এমন সময় খাওয়ার ডাক পড়িল

তাই তো, এখনো উহারা নামিতেছে না! মুকুলেশ একটা ঝি-কে উহাদের ডাকিয়া আনিতে পাঠাইল। ঝি আসিয়া খবর দিল যে তাহারা মোমবাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে, আর তাহাদের সাম্‌নের টেবিলে একরাশ পুরানো চিঠি, কাগজ-পত্র স্তূপীকৃত। দুইবার ডাকিয়া সে কোনো সাড়া পায় নাই, তৃতীয়বার লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিয়া দিয়াছে: যাও—আমরা কেউ খাবো না। অগত্যা মুকুলেশ একাই কতগুলি খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া আসিল। তারপর নীচের বারান্দায় ইজি-

চেয়ারে পড়িয়া সিগার ধরাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভাতের নেশায় একটু তন্দ্রার মতোও আসিল বুঝি।

হঠাৎ গলার স্বর শুনিয়া সে চম্‌কাইয়া উঠিল। বাহিরের দরজার কাছে লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া—সাগর নীচের সিঁড়িতে। লক্ষ্মী বলিতেছে: অনেক রাত হ'য়ে গেছে—এখন বাড়ি যাও. কাল আবার তোমাকে খুব ভোরে উঠ্‌তে হ'বে।

—কেন ?

—কাল খুব ভোরে আমি তোমার কাছে যাবো। কালই আমরা এলাহাবাদ চলে' যাচ্ছি কিনা !

—ও ! কালই ?

—হ্যাঁ গাড়ি তো সে—ই রাত্তিরে। সারাটা দিন তোমার সঙ্গে কাটানো যাবে। খুব ভোরেই যাবো কিন্তু।

—যেয়ো। আমি সারা-রাত ঘুমোবো না।

—না না, একটু ঘুমিয়ো ! নইলে দিনটা ভারি বিচ্ছিরি কাটবে।

—আগে সে-দিন আসুক্ তো !

লক্ষ্মী নিম্নস্বরে হাসিল।—আচ্ছা বেশ, না-ই বা ঘুমোলে। কবিতা লিখো।

—ছাই !

—নাও—আর কথা বল্‌তে হ'বে না—যাও এবার।

লক্ষ্মী সাগরের পিঠের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মুকুলেশ দেখিল, তাহার সমস্ত চুলগুলিকে টানিয়া আনিয়া সে বুকের উপর দিয়া দুই ভাগে ফেলিয়া দিয়াছে। চুলের আবরণ দিয়া নিজকে ঢাকিয়া সে যেন লুকাইয়া থাকিতে চায়।

৪

নির্ম্মলা ও সত্যবান সাগরকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া গেল—এই কয় ঘণ্টায় সে যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। মানুষের চোখে এমন সাংঘাতিক উজ্জ্বলতা তাহারা আর দেখে নাই। সেই চোখ দিয়া সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বহুদূরের কী একটা জিনিষ যেন দেখিতেছে—নির্ম্মলা-সত্যবানকে সে দেখিতেই পাইতেছে না! সত্যবান শঙ্কিত হইয়া বলিল, এত রাত্তিরে আর না-ই গেলে, সাগর—এখানেই থাকো।

সাগর মৃদুস্বরে বলিল, না। তাহার গলার আওয়াজ যেন বহুদূর থেকে ভাসিয়া আসিতেছে—তাহা এমনি, ক্ষীণ ও হাল্‌কা। মানুষের কণ্ঠস্বরেরও একটা শরীর আছে—সাগরের স্বর সেই শরীর হারাইয়া ফেলিয়াছে।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, ভাত খেয়েছ?

অদ্ভুত এক রকম হাসি সাগরের নীচের ঠোঁটে কাঁপিয়া উঠিল।

—না।

নির্ম্মলা সাগ্রহে বলিতে লাগিল—খাবে? আছে কিন্তু—গরমও আছে বোধ হয়। মাছ-টাছ সবি—

সাগর আবার বলিল, না।

—অন্য কিছু খাবে? লুচি? বা ফলটল? চা?

—আমার একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না, নির্ম্মলা। তোমার ঘরে মদ আছে?

—নেই।

—সত্যি নেই? একটু ব্র্যাণ্ডিও না?

—কিছুই নেই। কিন্তু থাক্‌লেও তোমাকে এখন দিতাম না। খালি পেটে—

—থাক্, আমি সত্যি খেতে চাই নি। হঠাৎ কেন যেন মনে হ'ল।

—দাঁড়িয়েই থাক্‌বে নাকি?

—দাঁড়িয়ে আছি নাকি? তা হ'লে এখন যেতে হয়।

—কথাটার মানে কী হ'ল।

—না, সত্যি এখন যাবো। তোমরা ঘুমোও।

—কেন এসেছিলে?

—এমনি। মনে হ'ল, তোমাদেরকে একবার দেখে যাই

—আহা, কতকাল যেন ছাখো নি!

—আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে।

নির্ম্মলা আলো লইয়া সাগরকে রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া [illegible] আসিল। হঠাৎ সাগরের মুখে চোখ পড়াতে [illegible] কেমন খারাপ হইয়া গেল। সাগরের হাত [illegible] তোমার চেহারা ভালো দেখা যাচ্ছে না, সাগর [illegible] খাবে [illegible] বাড়িউলির কাছ থেকে জোগাড় করা যায় কিন্তু।'

—না। এখন আর ইচ্ছে কর্‌ছে না খেতে।

নির্ম্মলা তবু দেরি করিতে লাগিল। বলিল, এসো, না আর-একটু বস্‌বে। সত্যি, আজ আর না-ই গেলে। শোবার কিচ্ছু অসুবিধে হ'বে না তোমার। তোমরা দু' জন বড় খাটে শোবে, আর আমি—

—না, আমি থাকতে পার্‌বো না, নির্ম্মলা। তুমি যাও, সত্যবান তোমার জন্যে বসে' আছে।

—আর-একটু বস্‌তেও পারো না এসে ?

—তুমি যাও, নির্ম্মলা।

—তোমার কি কোনো অসুখ করেছে, সাগর ?

—না। তুমি যাও, নির্ম্মলা, শোও গে।

—তুমি ?

—আমিও শোবো।

অগত্যা নির্ম্মলা সাগরের হাত ছাড়িয়া দিল।

[illegible]াগর ক্রমাগত হোটেলের ছাতে পায়চারি করিয়া [illegible]তেছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় সে ঘড়িতে বারোটা [illegible]নিট দেখিয়াছিল, মনে পড়ে—এতক্ষণে হয়-তো দেড়টা [illegible] চারটা ? কখন্ ভোর হইবে ? আকাশ [illegible] বোঝার উপায় নাই। এখন দিন বড় হইয়াছে— [illegible]ছ'টার আগেই ভোর হইয়া যায়। একেবারে ভোর [illegible]মিবে।

[illegible] সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, সে যে কখনো ঘুমাইয়াছিল, এ-কথা সে মনে করিতে পারে না। সে যে আর কখনো ঘুমাইবে, এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। ঈশ্বর-সম্বন্ধে সে অনেক উপলক্ষ্যে অনেক ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছে, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া লক্ষ লক্ষ আকাশ ছাইয়া একজন-কেহ যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত জাগিয়া আছে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ;—নহিলে এই সৃষ্টিকে ভালোবাসিবে কে ? এবং এই

সৃষ্টির মূলে যদি কোনো একজনের প্রেম না-ই থাকিবে, তাহা হইলে এতকাল ইহা টিঁকিয়া আছে কি করিয়া? প্রেম বিনিদ্র। কারণ, প্রেমের দায়িত্ব এত মহান্ যে মুহূর্তের জন্য চোখ বুজিবার অবসর নাই, প্রেমের আনন্দ এমন নিদারুণ যে তাহা মুহূর্তের জন্যও ঘুমাইতে দেয় না। প্রেম বিনিদ্র, তাই সাগর ইহজীবনে আর ঘুমাইবে না, বিধাতা যেমন অসীম সময়ের জন্য লক্ষকোটি তারায়-তারায় একখানি ক্লান্তিহীন জাগরণ মেলিয়া ধরিয়াছেন।...

আকাশ ফ্যাকাশে হইয়া আসিতেছে—ভোর হইল বুঝি। সাগর ছাতের কার্নিশে ভর্ দিয়া রাস্তায় উঁকি দিল। মৃত পথ। সাগর গলা বাড়াইয়া তাকাইয়াই রহিল;—এই পথ দিয়াই তো সে আসিবে। তাহাকে সে প্রথমে দূর হইতে দেখিবে।

দূরে ঐ একটি শাদা মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে না? দ্রুত পা ফেলিয়া আসিতেছে? হ্যাঁ, ঐ যে—ঐ তো, হোটেলের দর্জার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলোয় তাহার অদ্ভুত শাদা শাড়িটি ফেনার মত ফুলিয়া, গড়াইয়া, ভাঙিয়া যাইতেছে। সে আসিয়াছে—ঠিক সময়েই।

এতদিনে!—কিন্তু সে ঐ রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেন? এখানে আসিতে পারে না?

ঐ যে—আসিতেছে। ফুট্পাত্টি আস্তে-আস্তে সাগরের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল। সাগর অধীর আগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শাদা শাড়ির উপর কালো চুলও দেখা যাইতেছে। চুলগুলি খোলা—তেম্নি। ঐ তো কপাল—কপালের সেই ছোট দাগ—

সাড়া

সাগর ব্যাকুলভাবে দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেই—

তারপর যাহা হইল, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। অবস্থা-বিশেষে মানুষ ছাতের কানিশে ভর্ দিয়াও ঘুমাইয়া পড়ে, এবং সে-অবস্থায় ঘুমাইয়াও স্বপ্ন দেখে। তারপর—মানুষের শরীর শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না;—বহু নিম্নের বাঁধানো রাস্তাই সাগর রায়কে আশ্রয় দিল।

যে-বিশ্রী, ভারি শব্দটা হইল, তাহার প্রত্যুত্তরেই যেন হোটেলের ঘড়িতে ঢঙ্ করিয়া একটা বাজিল, আর সাগরের ঘরে ফাউস্‌ট্ হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া অতি দীর্ঘ ও করুণ এক আর্ত্তনাদ করিয়া চুপ করিয়া গেল।

লক্ষ্মী কিন্তু খুব ভোরেই আসিয়াছিল।